CENTRAL LIBRARY

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
ও
ভারতীয় রাজনীতি

University of Calcutta
Central Library
G11096

DATA ENTERED

UNIVERSITY LEADERSHIP PROGRAMME
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF CALCUTTA

শ্রীজ্ঞান হালদার

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

CENTRAL LIBRARY

নভেম্বর ১৯৮৬

প্রকাশক :
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ইউ. এল. পি. সাবকমিটির পক্ষে
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

B
954.045
H 129 S-D
C6

মুদ্রক :
ধীরেশ সান্যাল
শ্রীকৃষ্ণ বাইণ্ডিং ওআর্কস
১০ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
ও
সুশান্ত ভট্টাচার্য
সোমা মুদ্রণ
২এ কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

G 11,096

BCU 3920

প্রাপ্তিস্থান :
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশনা বিক্রয়কেন্দ্র
আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

দশ টাকা

CENTRAL LIBRARY

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনায় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আর্থিক সহায়তায় 'ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম'-এর প্রকাশনা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এই পুস্তক প্রকাশ করা হল। এই কর্মসূচীতে এর আগে পাঁচটি পুস্তক/পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান পুস্তকটি ষষ্ঠ ও সর্বশেষ প্রকাশনা। পূর্ববর্তী প্রকাশনাগুলির মত বর্তমান পুস্তকটিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাম্মানিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাবে আশা রাখি। আমাদের ধারণা সুধী শিক্ষকমণ্ডলী ও এ বিষয়ে আগ্রহী সকলের কাছে এই পুস্তকটি আদৃত হবে। লেখক যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা তাঁর নিজস্ব। এই বক্তব্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও মনে হতে পারে। তবে রচনাটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে ; তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাবেশ ঘটিয়ে গ্রন্থকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটকালকে নিজস্ব ভঙ্গীতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন, রচনাটির তাৎপর্য এইখানে।

'ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম' পরিচালনার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে প্রকাশনার কাজে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য, সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক প্রতাপ কুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-উপাচার্য (অর্থ) ড. দিলীপ কুমার সিংহ-এর কাছে প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থকারকে এই রচনার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
বিভাগীয় প্রধান ও পরিচালক
ইউনিভার্সিটি লীডারশিপ প্রোগ্রাম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ নভেম্বর ১৯৮৬

CENTRAL LIBRARY
COMPLIMENTARY COPY
UNIVERSITY LEADERSHIP PROGRAMME
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITY OF CALCUTTA

প্রথম অধ্যায়

সূত্রপাত—যে কোন দেশের ইতিহাসেই যুদ্ধের তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। সেই যুদ্ধ যদি বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে তার তাৎপর্য এবং গুরুত্বও অনেক বেশী বেড়ে যায়। ভারতবর্ষের রাজনীতিক, আর্থনীতিক এবং সামাজিক জীবনে দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবই পড়েছে খুব গভীরভাবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বের সঙ্গে এবং তার পরিণতির সঙ্গে এই কারণেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিশেষ করে তার চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করবার জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই কালপর্বের ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্ক এবং তার পটভূমির প্রাসঙ্গিক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের দ্বন্দ্ব, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব এবং তার সঙ্গে শ্রেণীগুলির সম্পর্ক ও ভূমিকার প্রশ্নগুলি। পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই সমস্ত দিক-গুলির সাধ্যমত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও বর্ণনার চেষ্টা করব।

পূর্বকথা—ইওরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির কাছে ভারত সাম্রাজ্যের গুরুত্ব অন্যান্য সাম্রাজ্যের থেকে অনেক বেশী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ব্রিটেন-ফ্রান্সের নিয়ত দ্বন্দ্বের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর মধ্যে একটা ছিল ভারতের উপরে আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা। ব্রিটেনের দিক থেকে আমেরিকার উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভারতই প্রধানতম ঔপনিবেশিক বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে নেপোলিঅনের মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের সময় তাঁর দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষের দিকে।[১] আর্থনীতিক শোষণের বিপুল উৎস হিসাবে এবং রাজনীতিক ও সামরিক অবস্থাগত দিক থেকে ভারতবর্ষ একই সঙ্গে লোভনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ভারতের সুপ্রচুর সম্পদ এবং জনবলকে শুধু ভারতের উপরে ঔপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্যেই যে ব্যবহার করে তা নয়, সমস্ত এশিআয় সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্যে যথাসম্ভব কাজে লাগায়। আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, চীন, ইরান, ইরাক, আরব, মিশর এবং ইথিওপিআ সর্বত্রই ভারতীয় সৈন্যদের ব্যাপক হারে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয় এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তারের

CENTRAL LIBRARY

প্রয়োজনে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করা হয়। এই নীতি বরাবরই ব্রিটিশ সরকার বজায় রেখেছিল। ভারতের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লর্ড রলিনসন (Rawlinson) কর্তৃক ১৯২১ সালে প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে ভারতের সামরিকবাহিনীকে প্রধানত তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটি, ফিল্ড আর্মি—চারটি ঘোড়সওয়ার ব্রিগেডসহ চার ডিভিশন আধুনিকভাবে সজ্জিত সৈন্যের এই বিপুল বাহিনী কেবল ভারতের বাইরে খুব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে পাঠানো হত। দ্বিতীয়, সীমান্তরক্ষীবাহিনী—এই বাহিনীকে প্রথম আক্রমণ মোকাবিলার জন্য তৈরি করা হত। সর্বশেষ, আভ্যন্তরিক নিরাপত্তাবাহিনী—ভারতীয় জনগণের বিদ্রোহ ও গণ আন্দোলন দমনের জন্যে যাকে ব্যবহার করা হত।[২]

ভারত সাম্রাজ্যকে অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর উপর চাপসৃষ্টির এবং প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যেই ভারতকে একটা বিশাল সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের জন্যে কুখ্যাত তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের নীচে উদ্ধৃত বক্তব্য থেকেই এই নীতির রাজনীতিক গুরুত্ব খোলাখুলিভাবে বোঝা যায়:

বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কেন্দ্রে ভারত সাম্রাজ্যের অবস্থান। ...কিন্তু ভারতের এই আধিপত্যমূলক অবস্থানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী বোঝা যায় যখন ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব লক্ষ করা যায়; অথবা, যখন দেখা যায় যে ভারতের প্রতিবেশীদের ভাগ্য তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।[৩]

ভারতের দরিদ্র জনগণের কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায় করে গড়ে তোলা হয়েছিল ভারতের সৈন্যবাহিনী। কিন্তু এই সামরিকবাহিনীকে ব্যবহার করা হত সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রয়োজনে এবং ভারতবাসীকে দমনের জন্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত একটি তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে ভারতের উপরে সামরিক কারণে চাপানো আর্থনীতিক বোঝার গুরুত্ব স্পষ্ট হবে:

সামরিক ব্যয় ১৯১৩—২৮[৪]

(নিযুত পাউণ্ডের অঙ্কে)

	১৯১৩	১৯২৮	শতাংশ হারে বৃদ্ধি
ব্রিটেন	৭৭	১১৫	৪৯
ভারত	২২	৪৪	১০০
অধিরাজ্যসমূহ (Dominions)	৯	১২	৩৩
মোট	১০৮	১৭১	৫৭

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেন তার নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে সামরিক খাতে যে পরিমাণ ব্যয় করে পনর বছর সময়ের মধ্যে তা শতকরা ৫০ ভাগও বাড়েনি, অথচ ভারতের ক্ষেত্রে সেই বরাদ্দের পরিমাণ একই সময়ে পুরোপুরি দ্বিগুণ হয় বা একশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ১৯১৩-১৪ সালের বাজেটের ৪২·৬ শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়। আর এই অঙ্ক ১৯২০-২১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় সমগ্র বাজেট বরাদ্দের ৫১ শতাংশে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বেসামরিক খাতে ব্যয় সংকোচের পরিমাণ একটানা বৃদ্ধি করে জনগণের উপরে ক্রমেই করের বোঝা বাড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩৬-৩৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের শতকরা ৫৪ ভাগ এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রের মিলিত বাজেট বরাদ্দের শতকরা ২৯ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়।[৫] এই প্রক্রিয়া ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

অপরদিকে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত থেকে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্যকে ফ্রান্স, পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, ইরাক প্রভৃতি দেশে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং বিস্তারের জন্যে পাঠানো হয়। এবং যুদ্ধের জন্যে ভারত থেকে সংগ্রহ করা হয় কোটি কোটি পাউণ্ড।

শুধু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষা এবং বিস্তারের ঘাঁটি হিসেবেই ভারত সাম্রাজ্যকে ব্যবহার করা হয়নি, ভারতের কাঁচামালে ব্রিটেনের আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে। এবং ভারতের নিজস্ব শিল্প নষ্ট করে এদেশে ব্রিটেনের শিল্পের বিরাট বাজার গড়া হয়।[৬] তাছাড়া ২০ থেকে ৩০ লক্ষ ব্রিটিশ নাগরিক ভারতে অথবা ভারতকে কেন্দ্র করে জীবিকা অর্জন করত। উইনস্টন চার্চিল ১৯৩৩ সালে হাউস অব কমন্সে এক বিবৃতিতে এই কথা জানান। ১৯৩৫ সালে চার্চিল এক বেতার ভাষণে ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার ভয়াবহ

CENTRAL LIBRARY

চিত্র দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটেনে এক লক্ষ লোক বেকার ভাতায় জীবন ধারণ করে, ভারত স্বাধীন হলে অন্তত আরও ২০ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে।[৭] এমনকি ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীও ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এত বেশী লাভবান্ হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও ঔপনিবেশিক শোষণের একান্ত অনুরাগী একটা বিরাট অংশ ছিল—ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮] অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে ঘাটতি পড়ত কেবল ভারতে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি করে সেই ঘাটতির দুই-পঞ্চমাংশ মেটানো হত।[৯]

ব্রিটেনের উন্নতির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তার আর্থনীতিক, প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক অবস্থাটা সংক্ষেপে একবার দেখা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরে ১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য হারে কর-ভার বৃদ্ধি করে। তিন বছরে এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল ৪০ শতাংশ। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের জন্যে 'ভারত সরকার আইন, ১৯১৯' পাস করা হয়। এর ফলে আটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যগুলির আর্থনীতিক দায়িত্ব এড়াবার জন্যেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

প্রদেশসমূহের সরকার দ্বৈত শাসন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশাসন প্রভৃতি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে মূল বিভাগগুলি সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলোও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থা একই রকম আপত্তিকর ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না, কেবল সম্পত্তিবান্-দেরই এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১০] সংস্কার আইনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে (১৯১৯) প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয়। দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন দাশ এই সংস্কারকে বর্জন করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী এর ঠিক বিপরীত ভূমিকা নেন এবং বলেন 'এই শাসনসংস্কার হল ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের ন্যায় বিচার করার প্রবল সদিচ্ছাজাত।' টিলক মধ্য পন্থা গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে দেশবন্ধুকে অপেক্ষা করতে হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিদানে মণ্টেগু-চেমস-

ফোর্ডের সংস্কার আইনেরও আগে যুদ্ধ থামার অব্যবহিত পরেই সর্বপ্রথম চূড়ান্ত দমনমূলক রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নির্দেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দমনের জন্যে আইন প্রণয়ণ সুপারিশের উদ্দেশ্যে রাওলাটের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয় তারই পরামর্শক্রমে কুখ্যাত দমনমূলক 'নৈরাজ্যবাদী এবং বিপ্লবী অপরাধ আইন, ১৯১৯' (Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) জারি হয়। এই আইন বলে নাগরিক স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে সংকুচিত করা হয়। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে যে আন্দোলন শুরু হয় তারই অংশ হিসেবে অমৃতসরে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিআন-ওআলাবাগের সভাক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনগণকে আচমকা যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে এক হাজারেরও অনেক বেশী মানুষ ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও অনেকে পরে মারা যান।[১২] জালিআনওআলা-বাগের গণহত্যার পরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে সমস্ত পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

ইতোমধ্যে তুরস্কের সুলতানকে পদচ্যুত করার জন্যে ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জমা হয়েছিল তাই খিলাফত আন্দোলন নামে ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সৃষ্টির কাজে লাগান এবং সৌকত আলী ও মহম্মদ আলীর সহায়তায় এই আন্দোলনের মুখ্য নেতা হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনে টিলক এবং অন্যান্য নেতাদের[১৩] সমর্থন ছিল না, কিন্তু গান্ধীজীর অধ্যবসায় ও কৌশলে অবশেষে (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২০) কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশনে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আগে পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের মত ব্যাপক সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিস ও গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি বারদোলিতে ১৯২২ সালের ১১-১২ ফেব্রুআরিতে গান্ধীজীর প্রস্তাবক্রমে গণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরতি ঘটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লীতে ২৪-২৫ ফেব্রুআরী সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।[১৪] অসহযোগ আন্দোলনের সাময়িক বিরতির পরে কংগ্রেস সংগঠনেও

CENTRAL LIBRARY

চিত্র দিয়ে বলেছিলেন যে, ব্রিটেনে এক লক্ষ লোক বেকার ভাতায় জীবন ধারণ করে, ভারত স্বাধীন হলে অন্তত আরও ২০ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাবে।[৭] এমনকি ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীও ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে এত বেশী লাভবান্ হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও ঔপনিবেশিক শোষণের একান্ত অনুরাগী একটা বিরাট অংশ ছিল—ব্রিটেনের শ্রমিক আন্দোলন যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৮] অপরদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের যে ঘাটতি পড়ত কেবল ভারতে ব্রিটিশ পণ্য রপ্তানি করে সেই ঘাটতির দুই-পঞ্চমাংশ মেটানো হত।[৯]

ব্রিটেনের উন্নতির সবচেয়ে বড় উৎস ছিল ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত তার আর্থনীতিক, প্রশাসনিক এবং রাজনীতিক অবস্থাটা সংক্ষেপে একবার দেখা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরে ১৯১৬-১৭, ১৯১৭-১৮ এবং ১৯১৮-১৯ সালে ভারত সরকার অবিশ্বাস্য হারে করভার বৃদ্ধি করে। তিন বছরে এই বৃদ্ধির মোট পরিমাণ ছিল ৪০ শতাংশ। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনেই শাসনসংস্কারের জন্যে 'ভারত সরকার আইন, ১৯১৯' পাস করা হয়। এর ফলে আটটি স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যগুলির আর্থনীতিক দায়িত্ব এড়াবার জন্যেই এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

প্রদেশসমূহের সরকার দ্বৈত শাসন নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয় এবং ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশাসন প্রভৃতি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে মূল বিভাগগুলি সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ক্ষেত্রগুলোও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল। ভারত সরকারের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থা একই রকম আপত্তিকর ছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না, কেবল সম্পত্তিবান্দেরই এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১০] সংস্কার আইনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে (১৯১৯) প্রবল মতবিরোধ উপস্থিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই সংস্কারকে বর্জন করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গান্ধীজী এর ঠিক বিপরীত ভূমিকা নেন এবং বলেন 'এই শাসনসংস্কার হল ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের ন্যায় বিচার করার প্রবল সদিচ্ছাজাত।' টিলক মধ্য পন্থা গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে দেশবন্ধুকে অপেক্ষা করতে হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিদানে মণ্টেগু-চেমস-

CENTRAL LIBRARY

ফোর্ডের সংস্কার আইনেরও আগে যুদ্ধ থামার অব্যবহিত পরেই সর্বপ্রথম চূড়ান্ত দমনমূলক রাওলাট আইন পাস হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের নির্দেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড দমনের জন্যে আইন প্রণয়ণ সুপারিশের উদ্দেশ্যে রাওলাটের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয় তারই পরামর্শক্রমে কুখ্যাত দমনমূলক 'নৈরাজ্যবাদী এবং বিপ্লবী অপরাধ আইন, ১৯১৯' (Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919) জারি হয়। এই আইন বলে নাগরিক স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে সংকুচিত করা হয়। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশে যে আন্দোলন শুরু হয় তারই অংশ হিসেবে অমৃতসরে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিআন-ওআলাবাগের সভাক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র জনগণকে আচমকা যেভাবে হত্যা করা হয় তাতে এক হাজারেরও অনেক বেশী মানুষ ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও অনেকে পরে মারা যান।[১২] জালিআনওআলা-বাগের গণহত্যার পরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাতে সমস্ত পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

ইতোমধ্যে তুরস্কের সুলতানকে পদচ্যুত করার জন্যে ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জমা হয়েছিল তাই খিলাফত আন্দোলন নামে ১৯২০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সৃষ্টির কাজে লাগান এবং সৌকত আলী ও মহম্মদ আলীর সহায়তায় এই আন্দোলনের মুখ্য নেতা হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনে টিলক এবং অন্যান্য নেতাদের[১৩] সমর্থন ছিল না, কিন্তু গান্ধীজীর অধ্যবসায় ও কৌশলে অবশেষে (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২০) কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশনে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩০-৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের আগে পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের মত ব্যাপক সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে পুলিস ও গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের ফলে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি বারদোলিতে ১৯২২ সালের ১১-১২ ফেব্রুআরিতে গান্ধীজীর প্রস্তাবক্রমে গণ অসহযোগ আন্দোলনের বিরতি ঘটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লীতে ২৪-২৫ ফেব্রুআরী সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।[১৪] অসহযোগ আন্দোলনের সাময়িক বিরতির পরে কংগ্রেস সংগঠনেও

CENTRAL LIBRARY

রণকৌশলগত মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করে এবং স্বরাজ্য দলের উদ্ভব ঘটে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে ভারত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ ব্রিটেন তার আর্থনীতিক বোঝা যতদূর সম্ভবপর ভারত সাম্রাজ্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে ১৯৩০-৩১ সালে ভারত সরকার সূতীবস্ত্রের উপরে আমদানী শুল্ক ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। একদিকে জনগণকে বাড়তি দামের বোঝা সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরেই বহন করতে হয়, অপরদিকে ভারতীয় কৃষিজীবী জনসাধারণের আয় দারুণভাবে কমে যায়। এর কারণ, ভারত থেকে যে-সব জিনিস বিদেশে (প্রধানত ব্রিটেনের মাধ্যমে) রপ্তানি করা হত সেগুলো ছিল প্রধানত কৃষিপণ্য এবং কাঁচামাল। আন্তর্জাতিক বাজারে এই পণ্যসামগ্রীর দাম মন্দার বাজারে অস্বাভাবিক পড়ে যায়। এর সঙ্গে আবার ১৯৩১ সালের শরৎকালে লণ্ডন সরকারের চাপে ভারতীয় টাকাকে পাউণ্ড স্টার্লিং-এর সঙ্গে জোর করে জুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ভারত ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকারের জরুরী বাজেট অনুমোদন করা হয় যাতে অভূতপূর্ব হারে কর বৃদ্ধি করা হয়। ব্রিটেনের বাজারে ভারত সরকারের দেনা শোধ করবার জন্যে ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা রপ্তানি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ সরকার ও পুঁজিপতিরা বারবার ভারত থেকে বহু হাজার কোটি টাকার সোনা লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।[১৫]

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ক্ষমতা বিস্তার করা একটা পুরনো সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। ভারতে ব্রিটিশ সরকার নিরন্তর ভেদনীতিকে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পরে বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এর প্রধান রাজনীতিক কারণ ছিল এই যে নেতারা আবার নিয়মতান্ত্রিক তথা সংসদীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করায় সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে গঠিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর নীতি (principle of separate electorate) অনুসরণ করে ভোট পাবার জন্যে হিন্দু এবং মুসলমান ভোটারদের কাছে তাঁদের সাম্প্রদায়িক আবেদন রাখতে হয়েছিল। এ ছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক এবং সামাজিক কারণও ছিল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও অধিকতর মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তি লাভ করে। ১৯১৯ সালের

CENTRAL LIBRARY

শাসনসংস্কার আইনের পর্যালোচনার জন্যে ১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই কমিশন (সাইমন কমিশন নামে খ্যাত) কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়, কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি এতে নেওয়া হয়নি। সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দিয়ে জাতীয় আন্দোলন ও সংহতিতে ভাঙন ধরানোই ছিল শাসন সংস্কার পর্যালোচনার লক্ষ্য। জাতীয় কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে পুরোপুরি বর্জন করে এবং তার বিরুদ্ধে সারা ভারতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং নানা জায়গায় হরতাল পালন করা হয় (ফেব্রুআরি ১৯২৮)। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়। এখানে গান্ধীজী মতিলাল নেহরু কমিটি প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত শাসনের স্বপক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বামপন্থী ও বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের নেতৃত্বে এর বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব আনবার চেষ্টা করেন। নেহরু পরে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন এবং সুভাষচন্দ্রের আনা প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[১৬] ইতোমধ্যে কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ঐ বছরে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় খসড়া তৈরির জন্যে যে সর্বদলীয় সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হয়, অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দাবির জন্যে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কলকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত না হলেও পরের বছর ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ও আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ ডাণ্ডী অভিযানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক লবণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯২১ সালের আন্দোলনের তুলনায় এই আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণ অনেক বেশী ব্যাপক হয়েছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকরা শুধু বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণই করেনি, তাদের শ্রেণী সংগঠনগুলিও অনেক মজবুত হয়ে উঠেছিল।[১৭] কিন্তু ১৯২১ সালের আন্দোলনের মত এই আন্দোলনও সফল হবার অনেক আগেই (অর্থাৎ, পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করা) গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আপস করেন এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি সাধিত হয় (৫ মার্চ ১৯৩১)। কংগ্রেসের প্রতিবাদী নেতাদের মধ্যে জওহরলাল তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও গান্ধীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র এর বিরুদ্ধে সমস্ত সম্ভাব্য সাংগঠনিক পদ্ধতিতে তীব্র প্রতিবাদ করেন। কংগ্রেসের যুব সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৩৩

CENTRAL LIBRARY

সালের ৯ মে ভিয়েনা থেকে ভি. জে. প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু যুগ্ম ইস্তাহারে 'ব্যর্থ' গান্ধীনেতৃত্বের পরিবর্তে আপসবিহীন সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে কংগ্রেসের ভিতরে নতুন দল গঠনের আহ্বান জানান।[১৮] ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় একটি সম্মেলনের মাধ্যমে 'কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল' বা Congress Socialist Party (CSP) প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্র দেব। এই দলের অন্যতম নেতা সম্পূর্ণানন্দ সম্মেলনের আগে সমাজতন্ত্রী কর্মসূচীর খসড়া দলিল রচনা করেন। উল্লিখিত দুজন ছাড়া এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসাবে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, ইউসুফ মেহেরআলী, অশোক মেহতা, মিনু মাসানী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম থেকেই এই দলে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী থেকে মার্কসবাদী পর্যন্ত বিভিন্ন মতাদর্শের কর্মীরা ছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও এই দল কংগ্রেস নেতৃত্বের সমর্থক ছিল না। অপরদিকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারাও এই দল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারকে সুনজরে দেখেননি। এছাড়া কংগ্রেসের ফৈজপুর সম্মেলনে (১৯৩৬) নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোট ১১টি প্রদেশে ১৫৮৫টি কেন্দ্রে নির্বাচন হয়। কংগ্রেস ৭১৫টি আসন পেয়ে ৭টি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এর মধ্যে কংগ্রেস বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ), বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইন সভায় নিয়ন্ত্রকক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং পরে সিন্ধু ও আসামে কোআলিশন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী মহলে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ গুরুত্বপূর্ণ চেহারা নেয়।[১৯]

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে ধারা গণরাজনীতির পাশাপাশি গড়ে ওঠে তা হল গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের একটা নতুন পর্যায়। সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান পুস্তকের পরিসরে প্রাসঙ্গিক নয়। সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, লালা হরদয়াল, কর্তার সিং, পিংলে প্রমুখের নেতৃত্বে এবং গদর, যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহায়তায় ভারতে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়। এর পরে ১৯৩০ সালের ১৮-২২ এপ্রিল 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ পাহাড়ে 'ইণ্ডিয়ান

রিপাবলিকান আর্মি' (চট্টগ্রাম শাখার) সঙ্গে পুলিস ও সামরিকবাহিনীর সম্মুখ সমর হয়। এই বছরেই ৮ ডিসেম্বর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামক বিপ্লবী দলের কর্মী বাদল গুপ্ত, বিনয় বসু এবং দীনেশ গুপ্ত দুপুর ১২-৩০ মিনিটে রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করেন।[২০] গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে যে গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মধ্যে সেই ধারা ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সামরিক অভ্যুত্থানের (এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়) এবং গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা রাসবিহারী বসু জাপানে রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে দক্ষিণ পূর্ব এশিআয় 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' গঠন করে আজাদ হিন্দ আন্দোলন সংগঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন (আজাদ হিন্দ আন্দোলন সম্পর্কিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অপরদিকে ভারতের বিপ্লবীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অধিকাংশই বিভিন্ন বামপন্থী দলে যোগ দেন, কেউ কেউ গান্ধীবাদের দ্বারাও আকৃষ্ট হন।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় রাজনীতি

১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পরে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের কোনো অধিবেশন হয়নি। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে হরিপুরায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় সেখানে সুভাষচন্দ্র বসু সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। যুদ্ধ-পূর্ব ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে হরিপুরা কংগ্রেসের গুরুত্ব খুব বেশী। এই অধিবেশনে দেখা যায় কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যা আগের থেকে বেড়েছে। তাঁদের সংঘবদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণভাবে এঁরা আগের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক পারেন ভূমিকায় অংশ নিতে। এর একটি কারণ, ১৯২১ এবং ১৯৩০ সালে দুটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজী এবং দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সরকারের সঙ্গে আপস করে জনগণকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন। দ্বিতীয় কারণটি হল দেশে কৃষক, শ্রমিক এবং যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলির অগ্রগতির ফলে সমাজতন্ত্রের ও বামপন্থার প্রভাব বেড়ে গিয়েছিল। ইওরোপে

CENTRAL LIBRARY

এই সময়ে আসন্ন যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার বিনিময়ে আর্থনীতিক শোষণ এবং রাজনীতিক নিপীড়ন বৃদ্ধির কথা স্মরণ করে বামপন্থীরা আসন্ন যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকে কোন রকম সহযোগিতা না করার পক্ষে সফল প্রচার চালায়। হরিপুরায় যুদ্ধ সম্পর্কিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার শেষ পরিচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি হল :

এই রকম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত কোনো অংশ নিতে পারবে না, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের জনবল ও সম্পদকে কাজে লাগাতেও দেবে না। ভারতীয় জনগণের ঘোষিত সম্মতি ছাড়া ভারত কোন যুদ্ধে যোগদানও করতে পারে না। সেই জন্যে ভারতে যুদ্ধের জন্যে যে প্রস্তুতি নেওয়া চলছে এবং সামরিকবাহিনী ও বিমান আক্রমণের যে মহড়া চলছে কংগ্রেস তাকে কোনভাবে অনুমোদন করছে না (কারণ) এই সবকিছুর মাধ্যমে যুদ্ধকে ভারত পর্যন্ত এগিয়ে আনার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার কোন চেষ্টা হলে তাকে প্রতিরোধ করা হবে।[২১]

এই সম্মেলনে ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও বিভক্ত করে শাসন করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র মত ব্যক্ত করেন।[২২] কিন্তু এই সময় থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীনেতৃত্বের মৌলিক প্রশ্নে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, পরের বছর এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য এবং ব্যাপক আকার নেয়। বস্তুত এই বিরোধ ব্যক্তিগত ছিল না। বরং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী শক্তির মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব হিসেবেই এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর প্রথম কারণ ছিল, দক্ষিণপন্থীরা সরকারের সঙ্গে একটা আপসে আসতে চাইছিলেন, অপরপক্ষ সংগ্রামকে আরও তীব্র ব্যাপক ও চূড়ান্ত করে তোলার পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত, সুভাষচন্দ্রের উদ্‌যোগে ও জওহরলালের সভাপতিত্বে এই সময়ে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিটির লক্ষ্য ছিল দেশের শিল্পায়নের ও আধুনিকীকরণের জন্যে বিজ্ঞানকে দেশের উন্নতির কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের পথনির্দেশ। গান্ধীবাদ পক্ষান্তরে বৃহৎ শিল্প সৃষ্টি ও আধুনিকীকরণের বিরোধী, এর ফলে স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের প্রশ্নে দুই পক্ষের মৌলিক বিরোধ দেখা দেয়।[২৩]

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতের রাজনীতি

(১৯৩৯—৪১)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় রাজনীতির চারটি ক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলির দ্বন্দ্ব ; দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের দ্বন্দ্ব ; তৃতীয়ত, বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তৃতি।

কংগ্রেস সংকট—কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণ অংশের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয় ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকেই যথার্থ অর্থে কোনো রাজনীতিক দল ছিল না, বরং অনেক আগে থেকেই কংগ্রেসকে একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করে তার মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ ও কর্মসূচী নিয়ে নানা দল গড়ে ওঠে। অনুরূপভাবে বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীসমূহ আলোচ্য সময়ে কংগ্রেস মঞ্চকে জাতীয় সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করার সুবিধের জন্য কংগ্রেস সভাপতি পদে একজন সর্বভারতীয় বামপন্থী নেতার নির্বাচন চাইছিল। অপরদিকে, বামপন্থী সভাপতি নির্বাচিত হলে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়ে যাবে, ব্রিটিশ সরকার বিপদে পড়বে এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে এই কারণে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁদের মনোনীত প্রার্থীর জয়কে তখন সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পট্টভি সীতারামাইয়া এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সভাপতি পদের জন্যে প্রস্তাবিত হয়। মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অনুরোধে পট্টভি সীতারামাইয়ার সমর্থনে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে সুভাষচন্দ্র ও সীতারামাইয়া সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণপন্থী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে অবতীর্ণ হন। গান্ধীজী তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত প্রভাব পট্টভির নির্বাচনের কাজে লাগান। জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের প্রার্থীপদ বিরোধিতা করেন। সুভাষচন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান। বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, জয়রাম দাস দৌলতরাম, জে. বি. কৃপালনী, যমুনালাল বাজাজ, শঙ্কর রাও দেও, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ নেতারা যৌথ

CENTRAL LIBRARY

বিবৃতি ও পৃথক্ পৃথক্ বিবৃতির মারফত তাঁদের চূড়ান্ত প্রচার চালান। সুভাষচন্দ্র পালটা বিবৃতি দেন।[১] ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুআরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র ২০৫ ভোটের ব্যবধানে পুনর্নির্বাচিত হন।[২] গান্ধীজি ৩১ জানুআরি এক বিবৃতিতে পট্টভির পরাজয়কে অনেক বেশী তাঁর নিজের পরাজয় ("…the defeat is more mine than his") হিসেবে অভিহিত করেন এবং দক্ষিণ-পন্থীদের তরফে এর পরে যে নবনির্বাচিত সভাপতির সমস্ত কাজে তথা চূড়ান্ত সংগ্রামে পরোক্ষ বাধা দেওয়া এবং অসহযোগ করা হবে তার ইঙ্গিত দেন।[৩] অচিরেই দক্ষিণপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং সমস্ত শক্তি কংগ্রেসেরই নির্বাচিত সভাপতি এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন এবং কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে একটা সম্পূর্ণ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (২৯ এপ্রিল ১৯৩৯)।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে এবং ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বহুদিন থেকে আসন্ন হয়ে উঠেছিল তা শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতীয় সাম্রাজ্যের রণকৌশলগত অবস্থান এবং সর্বাধিক রসদের স্বার্থে ভারতের মানুষকে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা চূড়ান্তভাবে দেখা গেল। এর জন্যে ভারত সরকারের দিক থেকে একদিকে প্রয়োজন ছিল জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে যে কোনো আন্দোলন। শ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষক অসন্তোষকে সমূলে ধ্বংস করার উপযোগী ব্যবস্থাবলী গ্রহণ ও এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় উৎপাদন ব্যাহত হতে না পারে, ব্রিটিশবাহিনীর অন্তর্ভূত ভারতীয় সৈন্যদের মনোবল ভেঙে না যায় এবং বিদেশী মিত্র যথা আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হতে না পারে, বা শত্রুপক্ষ ভারতের গণআন্দোলনের কথা এবং তার উপরে পুলিস ও সামরিকবাহিনীর অত্যাচার ইত্যাদির কথা প্রচার করে বিশ্বের জনমতকে ব্রিটিশবিরোধী করে না তুলতে পারে। অপরদিকে সরকার ভারতীয় জনগণকে বিভক্ত করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে যতদূর সম্ভব উসকানি দেয়। রাজনীতিকভাবে এই কারণে সরকার মুসলিম লীগকে ব্যবহার করে কেবল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী, সাম্প্রদায়িক এমন একটা শক্তি হিসেবে যাকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভেঙে দেবার কাজে 'লিভার'

(lever) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পরবর্তী আলোচনায় এই বিশ্লেষণের প্রমাণ মিলবে।

ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতও আপনাআপনি একটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (belligerent) দেশে পরিণত হল। সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় নৃপতিরা সরকারকে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। অপরদিকে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বাংলার অকংগ্রেসী সরকারগুলিও একই মর্মে প্রস্তাব পাস করলেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিক দলগুলির মধ্যে 'ন্যাশনাল লিবারাল ফেডারেশন' এবং হিন্দু মহাসভা যুদ্ধে সামগ্রিক সহযোগিতার প্রস্তাব সরকারী ভাবে (officially) গ্রহণ করেন।[৪] এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করার আগে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও আমলা মহলে মতবিরোধ

যুদ্ধের প্রথমার্ধে ভারত সরকার ভারতের জনগণকে যুদ্ধের সহযোগী করে তোলার থেকে তাদের যতদূর সম্ভবপর বিভক্ত করে দিয়ে আভ্যন্তরিক বিরোধের সুযোগে নিজেদের ইচ্ছেমত ভারতকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা চালায়।[৫] বি. আর. টমলিনসন-এর ভাষায় 'কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে যে ফাটল বিস্তৃত হতে থাকে তাই ছিল তাদের হাতে তুরুপের তাস।...তিনি (বড়লাট লিনলিথগো) এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদ দুটো দলেরই দাবিগুলোর বিরুদ্ধে এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কাজে লাগাতেন।'[৬]

লিনলিথগো মুসলিম লীগের সঙ্গে দরাদরিতে কখনওই লীগকে বেশী চটিয়ে দেবার পক্ষে ছিলেন না, কারণ সরকারের প্রতি লীগের আনুগত্য এবং সমর্থন ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম রাখার জন্যে অপরিহার্য ছিল—প্রধানত তার 'গণতন্ত্র বিরোধী' এবং 'জাতীয়তাবাদ বিরোধী' ভূমিকার জন্যে। উইনস্টন চার্চিল ১৯৪০ সালের প্রারম্ভে ভারতের ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে এই বলে দোষারোপ করেন যে 'ভাইসরয় কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন তা আত্মঘাতী নীতি' এবং বলেন যে হিন্দু মুসলমান বিরোধই হল ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার প্রধান স্তম্ভ।[৭] অপরদিকে মুসলিম লীগের সঙ্গে জিন্নার মাধ্যমে সমঝোতায় আসা সহজ এবং লীগ ব্রিটিশ সরকারের কাছে নিকট

CENTRAL LIBRARY

ভবিষ্যতে খুব দরকারী আর দূর ভবিষ্যতেও তাকে বাগ মানানো কিছু কঠিন নয়।[৮]

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি কংগ্রেসের ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিরোধ অনেক দূর গড়ায় এবং ব্রিটিশ সরকারও সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে তৈরী হয়। এই সময়ে 'বিপ্লবী আন্দোলন অর্ডিন্যান্স' (Revolutionary Movement Ordinance) জারির চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে সরকারীভাবে একটা ইস্তাহার তৈরি করা হয়। এর আগেই ১৯৩৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'ভারত রক্ষা আইন (১৯৩৯ সালের ৩৫ নং আইন)' জারি করা হয়। এই আইনে যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখা, বিচারের প্রহসন করে ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তের বিনা উপস্থিতিতেই তাকে সাত বছর অবধি সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া এবং ডাক-তার টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উপরে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বলবৎ করা হয়।

১৯৪০ সালের উপরে উল্লিখিত ইস্তাহারে কংগ্রেস যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহ শুরু করার যে প্রস্তাব দেয় তাকে 'কংগ্রেসের নিজের আদর্শের প্রতি এবং দেশের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা' বলে অভিযোগ করা হয়। বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইস্তাহারে বলা হয় যে সরকার কোনদিনই কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মনে করে না। বাকী দলগুলোর স্বার্থরক্ষা করাও সরকারের কর্তব্য। তা ছাড়া, এমন বহু ভারতীয় থাকতে বাধ্য যারা কংগ্রেসের যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে, কংগ্রেস নেতাদের মানে না এবং এ কথা বোঝে যে ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, বর্তমানে সংকটময় দিনে যে-কংগ্রেস তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে **তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন** করার মাধ্যমেই ভারত বিশ্বের কাছে আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই ইস্তাহার থেকে সরকারের মনোভাব ও প্রচেষ্টা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। ইস্তাহারে ভারতের জনগণকে যুদ্ধের কাজে ব্রিটিশ সরকারকে সমস্ত রকমে সাহায্য করবার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় যে যারা এই কাজ করবে তারা এর জন্যে যথাযোগ্য মর্যাদা ও পুরস্কার পাবে।[৯] অর্থাৎ দেশদ্রোহিতা করার জন্য জনগণকে খোলাখুলি ঘুষের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। উক্ত অর্ডিন্যান্সে একটা মারাত্মক ধারা সংযোজিত ছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, যে-সব ব্যক্তিকে এই অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করা হবে বা যে-সব দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হবে ভবিষ্যতে

CENTRAL LIBRARY

তাঁরা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না বা ঐ দল ভবিষ্যতে কখনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সুচতুরভাবে এই ধারা যোগ করা হয় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে। ভাইসরয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যর রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ভাইসরয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠান যে শুধু কংগ্রেসকে দুর্বল করে সরকারের আরোপিত শর্তাবলী মানতে বাধ্য করলেই যথেষ্ট হবে না বরং 'একটা রাজনীতিক দল হিসাবে কংগ্রেসকে ধ্বংস করে দিতে হবে।'[১০] সরকার যে পরিকল্পনা করে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কংগ্রেস নেতাদের পাইকারী গ্রেপ্তার, যে-সব সরকারী কর্মচারীকে (উচ্চ এবং নিম্নপদস্থ) রাজভক্ত বলে মনে হবে না তাদের গ্রেপ্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া এবং কংগ্রেসের সমস্ত দলীয় কার্যালয় এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া ইত্যাদি। অপরদিকে ঐ অর্ডিন্যান্সে সরকারের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয় এক কথায় বলা যেতে পারে সেটা হল বিপ্লব দমন করার নামে যা খুশি করার ক্ষমতা।

'বিপ্লবী আন্দোলন অর্ডিন্যান্স' নামকরণ কেন্দ্র করে সরকারী মহলে প্রথমে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়, 'কারণ এই অর্ডিন্যান্সের ফলে আমেরিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে এবং জার্মানরাও তাদের বেতার প্রচারে এর ফলে লাভবান্ হতে পারে।' নানা মতপার্থক্যের পরে শেষ অবধি ঠিক হয় অর্ডিন্যান্সের সংক্ষিপ্ত নাম হবে, 'জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' (Emergency Power Ordinance) এবং বিদেশে এই নামই প্রচার করা হবে।[১১] কিন্তু বহু আমলাই এই অর্ডিন্যান্স জারির বিপক্ষে ছিলেন। উত্তর প্রদেশের গভর্নর স্যর মরিস হ্যালেট ভারত রক্ষা আইন দিয়েই যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেসের মোকাবিলা করায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে এই 'অর্ডিন্যান্স প্রশাসনিক দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর আর রাজনীতিক দিক থেকে একটা ভুল।' কারণ হিসাবে তিনি বলেন: 'যদি আমরা দেশের একটা রাজনীতিক দল হিসেবে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে চাই, তাহলে কংগ্রেসের যারা আংশিক সমর্থক তাদেরকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কংগ্রেসকে ধ্বংস করার ইচ্ছে সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই, কিন্তু আমি শুধু বলতে চাই যে এটা তার পথ নয়।...ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান, কিছু রক্ষাকবচ থাকলেও, ভারতীয়রা নিজেরাই নির্ধারণ করবে—একথা বলার পরে একমাত্র যুদ্ধের কাজে বাধা

CENTRAL LIBRARY

সৃষ্টি করছে—এই কথা না বলে অন্য কোনভাবে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে পারম্পর্যহীন কাজ হবে।'[১২] কাজেই তাঁর বিচারে যে-সব লোক কংগ্রেসের ঘোরতর সমর্থক নয় নাৎসী বিদ্বেষের উসকানি দিয়ে তাদের কংগ্রেস-বিরোধী করে তোলার চেষ্টা চালানো যেতে পারে।

কিন্তু স্যর রেজিনাল্ড এই ধারণার প্রবল বিরোধিতা করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে কংগ্রেসের আর কিছু মাত্র জনসমর্থন অবশিষ্ট নেই, এবং এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' করেই কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাবে। সরকারের তরফে এই অর্ডিন্যান্স পছন্দ করার দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমত, ভারত রক্ষা আইনের মেয়াদ বেশীদিনের নয়। কাজেই সরকার বনাম কংগ্রেসের লড়াই শেষ হবার আগেই এর মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আরও গুরুত্বপূর্ণ যে ভয় সরকারের ছিল তা হল, ভবিষ্যতে কংগ্রেস নতুন সংবিধান বলে অনেক বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রেও ক্ষমতাশালী হতে পারে যার ফলে যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সরকারের সম্ভাব্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজের দাবি হাসিল করে নিতে পারে। সেইজন্যেই এই অর্ডিন্যান্সে আন্দোলনকারী দলকে ভবিষ্যতেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না দেবার স্পষ্ট নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়। নীচুস্তরের আমলারা কংগ্রেসের আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে সব সময়ই এই ভয়ে থাকত যে যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে তাহলে তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে। সরকার এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এইসব আমলা ও সরকারী কর্মচারীদেরও নিশ্চিন্ত করতে চাইছিল। গভর্নরের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে যে-সব ভারতীয় সদস্য ছিলেন তাঁদের বাস্তব ক্ষমতা এবং মর্যাদা এত কম ছিল যে, ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলন শুরু হয়ে যাবার পরেও কাউন্সিলের একটা সভায় এই অর্ডিন্যান্স অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয় এবং ঐ সভাতেই সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিন্যান্সটিকে অনুমোদন করানো হয়। এর অনেক আগেই এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চস্তরের আমলাদের এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হয়েছিল এবং আলোচনা করা হয়েছিল।

CENTRAL LIBRARY

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভূমিকা

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনো বিবৃতি দেবার আগেই এবং এ সম্পর্কে ওআর্কিং কমিটি বা সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগেই গান্ধীজী এবং নেহরু যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত সংবাদপত্র মারফত প্রচার করেন। গান্ধীজী লেখেন: 'আমি এখন কেবল ভারত উদ্ধারের কথা ভাবছি না। সেটা হবে, কিন্তু তার কি মূল্য থাকবে যদি ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের পতন হয়, অথবা যদি জার্মানীর ধ্বংস আর অপমানের মধ্যে দিয়ে তারা জয়লাভ করে?'[১৩] অপরদিকে জওহরলাল নেহরু তাঁর এক বিবৃতিতে (সেপ্টেম্বর) শুধু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন: 'ব্রিটেনের অসুবিধের থেকে নিজেদের সুবিধে বার করে নেওয়াটা আমাদের দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের পথ হবে না।...একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অপরদিকে ফ্যাসিবাদ ও আগ্রাসন এই দুটির মধ্যেকার লড়াইয়ে আমাদের সহানুভূতি অবশ্যম্ভাবীরূপে থাকবে গণতন্ত্রের পক্ষে...আমি চাই ভারত এই যুদ্ধে তার পূর্ণ ভূমিকা পালন করুক এবং নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করুক।'[১৪]

গান্ধীজী এবং নেহরু-প্রদত্ত বিবৃতি থেকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নে কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণপন্থী শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরো স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ ১৯৩৮ সালের ফেব্রুআরি মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে যুদ্ধ-বিরোধী যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় দুজনের উপরে উল্লিখিত বিবৃতিই তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এর থেকে মনে হয় কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী নেতৃবৃন্দ অতি অল্পদিনের মধ্যেই, অর্থাৎ সত্যিই যখন যুদ্ধ বাধল, তখন হরিপুরা প্রস্তাবকে অর্থহীন ছেঁড়া কাগজে পরিণত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। এবং তাঁরাই কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হওয়ায় দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্যেও তাঁদের কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। যুদ্ধের শুরুতে গান্ধীজী এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে যুদ্ধ-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য ছিল উপরের বিবৃতি দুটি থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গান্ধীজী তাঁর অহিংসার আদর্শের দিক থেকে যে কোনো ধরনের যুদ্ধেরই ঘোরতর বিরোধিতা করেন, এবং এক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। অপরদিকে যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবল বিরোধিতা করেন তাঁরই একান্ত অনুগত সমর্থক

CENTRAL LIBRARY

জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। এর মধ্যে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আগেই দেখেছি, তিনি এই যুদ্ধে শর্তহীনভাবে ব্রিটেনকে সহযোগিতা করার পক্ষে ছিলেন। মৌলানা আজাদ প্রমুখ বাকী নেতারা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, যুদ্ধকালীন ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতাবৃদ্ধি, সংবিধানসভা (কনস্টিটিউএন্ট অ্যাসেম্বলী) গঠন প্রভৃতি শর্তে এই যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী ছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি যুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার আগে যে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাতে গান্ধীজী তাঁর সামগ্রিক যুদ্ধবিরোধিতার প্রস্তাবে মোট চারজন সদস্যের সমর্থন পান। এঁরা হলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব, আচার্য কৃপালনী, দৌলতরাম এবং প্রফুল্ল ঘোষ।[১৫] অপরদিকে নেহরুর নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাবও গৃহীত হয়নি। বরং যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ভারতীয় জনগণের সম্মতি ছাড়াই ভাইসরয় কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করা হয়। এই প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ভারতের সম্পদকে শোষণ করা ও কাজে লাগানোর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা হয় এবং বলা হয়, 'গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্যে যে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে ভারত তার মধ্যে থাকতে পারে না যখন সেই স্বাধীনতা থেকেই তাকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।' এই প্রস্তাবে আরো বলা হয়: 'সেইজন্যই ওআর্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে আহ্বান করছে গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, যে নতুন ব্যবস্থা প্রণয়নের কথা বলা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কি, এবং বিশেষ করে ভারতে তাকে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং বর্তমানেই তার চেহারা কি দাঁড়াবে সে কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করার জন্যে।'[১৬] ১০ অক্টোবর এ. আই. সি. সি-র সভায় এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং বলা হয়: 'ভারতকে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে হবে। এবং বর্তমানেই যতদূর সম্ভবপর তা প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে এই মর্যাদা দিতে হবে।'[১৭]

কিন্তু কংগ্রেসের তরফে যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্যে সুস্পষ্ট শর্ত আরোপ করা হলেও সরকারের তরফে বিন্দুমাত্র নমনীয়তা দেখা গেল না। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ১৭ অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তাতে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা (ভারতের স্বাধীনতা নয়) ব্রিটিশ

নীতি। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন তার কোনো সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে '১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন'কে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগীভাবে পরিবর্তন করা হবে। তবে এই কাজে সংখ্যালঘুদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতকে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে, একথাও তিনি জানিয়ে দেন। অর্থাৎ, এই অজুহাতে ভবিষ্যতেও সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়ে স্বাধীনতার দাবিকে নাকচ করার বন্দোবস্তও তারা করে রাখলেন। যুদ্ধের সহযোগিতায় ভারতীয়দের ভিড়িয়ে নেবার কৌশল হিসাবে তিনি ঘোষণা করেন, যুদ্ধের ব্যাপারে জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে গভর্নর-জেনারেলের নিজের সভাপতিত্বে সমস্ত বড় রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং রাজন্য-বর্গের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা উপদেষ্টাগোষ্ঠী তৈরি করা হবে। বলা বাহুল্য এই ধরনের উপদেষ্টাগোষ্ঠীর কার্যত ক্ষমতা কিছুই থাকে না এবং এই গোষ্ঠীর সদস্যদের একমাত্র কাজ হয় সরকারের সমস্ত নীতিতে সায় দিয়ে যাওয়া।

কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি ভাইসরয়ের এই প্রস্তাবকে 'পুরনো সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই পুনঃপ্রকাশ' বলে খারিজ করে। সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রথম স্তর হিসেবে ওআর্কিং কমিটির নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রী ১৫-২৭ নভেম্বরের মধ্যে (১৯৩৯) পদত্যাগ করেন।[১৮] এর আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সরকার উপদেষ্টাগোষ্ঠীতে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করে। কিন্তু কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল আগে স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকার করতে হবে এবং সংবিধান পরিষদ গঠন করতে হবে।

অন্যদিকে ভাইসরয়ের ঘোষণার পরের দিন, অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর, মুসলিম লীগ ঘোষণা করে যে এই যুদ্ধে ঐ দল একটা শর্তে সহযোগিতা করতে রাজী আছে। শর্ত হল 'মুসলমান-ভারতের হয়ে কথা বলবার একমাত্র হকদার মুসলমান সংগঠন' মুসলিম লীগের অনুমোদন ছাড়া ভারতের কোন ধরনের সাংবিধানিক অগ্রগতি ঘটানো চলবে না।[১৯] জিন্না সংবিধান সভা গঠনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন এই সভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে; ফলে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দাবি আদায়ের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। ১৯২০ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা হয়ে ওঠেন। তার আগে পর্যন্ত জিন্না নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। এই সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে গুরুতর বিরোধ দেখা দেওয়ায় জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করেন, কিছুদিন ইংল্যাণ্ডে আইন ব্যবসা করেন এবং ফিরে এসে মুসলিম লীগে যোগ

CENTRAL LIBRARY

ঠেপে ৩৭২০

দেন।[19(ক)] তাঁর নেতৃত্বে এবং কবি ইকবালের সভাপতিত্বে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে লীগের সম্মেলনে সর্বপ্রথম 'মুসলমানদের জন্যে ভারতীয় হোমল্যাণ্ড' দাবি করা হয়। ইকবাল পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বালুচিস্তানকে মিলিত করে একটি উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের দাবি করেন।[20] এই দাবিকেই দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পৃথক্ রাষ্ট্রের জন্যে মুসলিম লীগের আদি দাবি বা পাকিস্তান দাবির সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার যে নির্বাচন হয় তাতে লীগের ফলাফল ভালই হয়েছিল, যদিও লীগ ছাড়া অন্যান্য মুসলমান সংগঠন ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব রাজ্যসভায় মিলিতভাবে লীগের থেকে বেশী ছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি নেহরু লীগের গুরুত্ব ঠিকমত বুঝতে পারেননি। জিন্না লীগের লখনৌ অধিবেশনে কংগ্রেসকে একটি হিন্দু সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে এত সুষ্ঠুভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেন যে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে জনসংযোগ গড়ার যে পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসামের মুসলমান দলগুলির নেতারা তাঁদের কর্মীদের লীগে যোগদানের নির্দেশ দেন। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে লীগের সঙ্গে সমঝোতার জন্যে কংগ্রেস যত চেষ্টা করে সবই ব্যর্থ হয়, কারণ যে কোনো সমঝোতায় আসবার আগে লীগের পূর্ব শর্ত ছিল কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে এবং লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে সমান মর্যাদায় বিচার করতে হবে এবং তার ভিত্তিতেই যে কোনো আলোচনা চলতে পারে। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পরে কংগ্রেসের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্যে ব্রিটিশ সরকার মুস্‌লিম লীগকে সহযোগী দল হিসাবে আরো বেশী গুরুত্ব দিতে থাকে। সাতটি প্রদেশ (যথা বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ) থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করায় ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কংগ্রেস বিরোধিতা এবং লীগের স্বপক্ষে প্রচার চালানো খুব সহজ হয়। লীগ ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে সরকারীভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যে পৃথক্ রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সময়ে লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের মুহূর্তে ভারতবাসীকে দ্বিধাবিভক্ত করার সুবর্ণ সুযোগ ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায় আর সরকার লীগকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল হিসেবে তুরুপের তাসের মতই ব্যবহার করতে থাকে।[21]

954.045 H 129 S-D
C6

CENTRAL LIBRARY

অপরদিকে যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পূর্ণ অসহযোগের দাবি এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার জন্যে যতদূর সাধ্য চাপ দিতে থাকেন এবং ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চালাতে থাকেন। এর কথা আমরা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করব। কিন্তু সেই আন্দোলন যে কংগ্রেস কর্মীদের সারা ভারতে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল তা নেতাদের বিচলিত ভাব দেখে এই সময়েই বোঝা যায়। নেতারা ক্রমে একথা বুঝতে পারেন যে কোনোরকম সংগ্রাম শুরু না করলে জনগণকে কংগ্রেসের সঙ্গে পাওয়া যাবে না; বামপন্থীরাই তাদের সমর্থন টেনে নেবে।

১৯৪০ সালের প্রথমার্ধে নেহরু এবং গান্ধী দুজনেই ওআর্কিং কমিটির পূর্বোক্ত যুদ্ধবিরোধী ও স্বাধীনতাকামী প্রস্তাব সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ব্রিটিশদরদী বিবৃতি দিতে থাকেন। যেমন নেহরু বলেন, 'ব্রিটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যস্ত সেই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের সম্মান খর্ব করবে।'[২২] এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বক্তব্য : 'ব্রিটেনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। এটা অহিংসার পথ নয়।'[২৩] শেষ অবধি কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ নেহরুকে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজী করাতে সমর্থ হয়েছিলেন, যদিও এর বিনিময়ে নেহরুর প্রিয় 'গণতান্ত্রিক শিবির'কে সমর্থনের নীতি ঘোষণা করতে হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর শান্তি এবং অহিংসার নীতিতে এতই অটল থাকেন যে শেষ পর্যন্ত জুন মাসে ওআর্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সভায় দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে সোজাসুজি বিরোধ দেখা দেয়। মৌলানা আজাদ গান্ধীবিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন। তাঁর নিজের ভাষায়: 'তিনি (গান্ধীজী) আমাকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন করার জন্য বারবার চাপ দিতে থাকেন। আমি ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি কিন্তু কিছুতেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করতে পারিনি। আমার কাছে অহিংসা কোনো আদর্শ নয়; একটি কর্মনীতি। আমার বক্তব্য ছিল আর কোনো উপায় অবশিষ্ট না থাকলে ভারতবাসীর তলোয়ার ধরবার অধিকার আছে। তবে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারলে সেটা অনেক বেশী মহান্ হবে। তবে ভারত যে অবস্থার মধ্যে দিয়েই চলুক না কেন গান্ধীজীর অনুসৃত পথ পদ্ধতি সঠিক।'[২৪]

আজাদ ওআর্কিং কমিটির সভায় জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল,

G 11,096 DATA ENTERED

CENTRAL LIBRARY

রাজাগোপালাচারী এবং খান আব্দুল গফুর খানের সহায়তা লাভ করেন। অপরদিকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনী এবং শঙ্কর রাও দেও পুরোপুরি গান্ধীজীর পক্ষে ছিলেন।[২৫] এই সভায় দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থক্যের জন্যে কংগ্রেস-কার্যক্রমের নেতৃত্ব থেকে গান্ধীজীকে অব্যাহতি দিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৬] পুনাতে জুলাই মাসে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় তার মধ্যে একটিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক পথ হিসাবে অহিংসার প্রতি পুনর্বার আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। এই নীতিই যে ভবিষ্যতে মেনে চলা হবে সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে নাৎসীবাদ এবং গণতন্ত্রের মধ্যে লড়াইয়ে ভারতের সঠিক স্থান হবে গণতান্ত্রিক শিবিরে। কিন্তু ভারত নিজে স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শিবিরের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে অংশ নিতে পারবে না। দুটি প্রস্তাবই আজাদ খসড়া করেন।[২৭] এইভাবে একই সঙ্গে গান্ধীজীর মুখরক্ষার ব্যবস্থা করা হল, বামপন্থীরা, বিশেষত সুভাষচন্দ্র, যাতে আপসহীন সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে কংগ্রেসকে কোনভাবে ব্যবহার করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করা হল এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের পথ খুলে রাখা হল। এই অবস্থায় আসবার জন্যে অবশ্য গান্ধী-অনুগামীরা, যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আব্দুল গফুর খান, সর্দার প্যাটেল এবং আরো অনেকে, আজাদের কাছে পদত্যাগের হুমকি দেন। তবে সরকার আজাদের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত দাবি মেনে না নিলে তাঁরা পদত্যাগ করবেন না বলেও আশ্বাস দেন।[২৮]

১৯৪০ সালের ৮ অগস্ট ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো তাঁর বিখ্যাত 'অগস্ট প্রস্তাব' ঘোষণা করেন। এতে অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে কেবল গভর্নর-জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল প্রসারিত করার এবং যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের কথাই বলা হয়েছিল। ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী সংবিধান সভা গঠনের কথাও স্বীকার করা হয়, তবে সেটা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেই কেবল গঠিত হতে পারে একথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মুসলিম লীগকে এই বলে সন্তুষ্ট করা হয় যে ভারতের জাতীয় জীবনের বৃহৎ এবং শক্তিশালী উপাদানসমূহ যাকে স্বীকৃতি দেবে না সরকার সে রকম কোন ব্যবস্থাই মেনে নেবে না। এই অগস্ট প্রস্তাব যে সবার কাছেই অর্থহীন এবং বিবেচনার অযোগ্য ছিল তা ব্যাখ্যা করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :

প্রকৃতপক্ষে 'অগস্ট প্রস্তাব' (August offer) কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সংখ্যালঘুদের যে গ্যারান্টি এখানে দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের দৃষ্টিতে তা ছিল জিন্নার হাতে এমন ভেটো ক্ষমতা তুলে দেওয়া যাতে তিনি সমস্ত সাংবিধানিক প্রগতিকে বন্ধ করে দিতে পারেন। অপরদিকে মুসলিম লীগ যে-কোনো ধরনের সংবিধান সভা গঠনেরই বিরোধী ছিল কারণ এই ধরনের সভায় মুসলমানেরা অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘুতে পরিণত হবেন। বস্তুত তখন সব কিছু যেভাবে হয়েছিল তাতে (দুটি দলের কাছে) যে দুটি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা কার্যগতভাবে পরস্পরকে বাতিল করে দিয়েছিল।[২৯]

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এই প্রস্তাব আলোচনা করার জন্যে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। অপরদিকে গান্ধীজী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে হিটলারকে চিঠি লিখে আগ্রাসন বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে তিনি বলেন ব্রিটিশ জনগণের উচিত অস্ত্র ত্যাগ করা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে হিটলারকে প্রতিরোধ করা। গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে ভাইসরয় এতই হতবাক্ হন যে তাঁর কথার উত্তর দেবার সৌজন্যটুকুও ভুলে যান।[৩০]

ব্রিটিশ সরকারের 'অগস্ট প্রস্তাব'-এর পরে কংগ্রেসের কার্যক্রম কি হবে তা নিয়ে নেতারা মুশকিলে পড়েন। কেননা, সরকার তাঁদের দেওয়া আপসের ফরমুলা অগ্রাহ্য করায় নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে তাঁদের আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গতি ছিল না। কিন্তু আগেই আমরা দেখেছি, শুধু গান্ধীজী নন জওহরলাল নেহরুর মতো নেতারা কোনক্রমেই আন্দোলন শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এক্ষেত্রে গান্ধী যে নির্গমনের পথ করে দিলেন সেটা হল সীমিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ১৯৪০ সালের ১৭ অক্টোবর এই আন্দোলনের প্রথম ব্যক্তিগত স্তর শুরু করা হয়। পরের মাসের ১৭ তারিখ থেকে শুরু হয় 'প্রতিনিধিত্বমূলক সত্যাগ্রহ' এবং ১৭ ডিসেম্বর থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়।[৩১] যদিও পরের বছরের ৫ জানুআরি থেকে সত্যাগ্রহ আবার শুরু করা হয়, কিন্তু প্রায় সারা বছর ধরে এই সত্যাগ্রহ চললেও প্রায় কেউই এ সম্পর্কে উৎসাহী হননি। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের চারটি স্তর পরিকল্পনা করেন। প্রথম ধাপটি ছিল ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহীদের গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে বাছাই করেন। প্রথম সত্যাগ্রহী

হন বিনোবা ভাবে, জওহরলাল নেহরু দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী মনোনীত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে গান্ধীজী ওআর্কিং কমিটি, এ. আই. সি. সি. এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলো থেকে স্বেচ্ছাসেবী বাছাই করেন। এই পর্যায়ে মাত্র ৫০০-৬০০ জন গ্রেপ্তার হন। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি যে তালিকা তৈরি করে সেই অনুযায়ী ২০০০ কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন। চূড়ান্ত স্তরে, এপ্রিল মাস থেকে কংগ্রেসের সমস্ত সাধারণ সদস্যদের সত্যাগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া হয়। জুন মাসের মধ্যে পুলিস ২০,০০০ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে। অল্পদিনেই এই আন্দোলনের প্রায় সমস্ত গুরুত্বই চলে যায় এবং অক্টোবর মাসে কেবল ৫,৬০০ জন সত্যাগ্রহী জেলে ছিলেন।[১২]

উপরে প্রদত্ত হিসেব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই সত্যাগ্রহ কখনওই গণ আন্দোলন ছিল না। গণ আন্দোলনকে লাগাম পরাবার এই ব্যবস্থা যে কংগ্রেস সভাপতি আজাদ পর্যন্ত মেনে নিতে পারেননি তা তিনি নিজেই স্পষ্ট বলেছেন :

'দিল্লী এবং পুনায় অনুষ্ঠিত সভার পরে, যখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন গান্ধীজী সীমিত আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ভাবেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, নারী-পুরুষ সবাই ব্যক্তিগত-ভাবে ভারতকে যুদ্ধে টেনে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে এবং গ্রেপ্তার বরণ করবে। আমার মত ছিল আরো ব্যাপক এবং সক্রিয় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে কিন্তু গান্ধীজী তাতে সম্মত হন না। যেহেতু গান্ধীজী আর এগোতে রাজী ছিলেন না আমি তাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিই যে অন্তত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হওয়া উচিত।'[১৩]

যুদ্ধের শুরু থেকেই বামপন্থীরা বিশেষত ফরওআর্ড ব্লক গণ আন্দোলন শুরু করার পক্ষে একটানা প্রচার চালাচ্ছিল। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের পরিচালনায় আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এই আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি রক্ষা আরও কঠিন হয়ে ওঠে এবং বহু সাধারণ কংগ্রেসকর্মী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। গান্ধীজী তাঁর সীমিত সত্যাগ্রহের মাধ্যমে প্রথমত কংগ্রেসের বামপন্থী অংশকে হাতে রাখতে চেয়ে-ছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আন্দোলন যাতে তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনভাবেই চলে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। গান্ধীজী

তাঁর বন্ধুদের কাছে এই সময়ে স্বীকার করেন : 'কখনও কখনও আমাদের যুবকদের সাহসিকতায় আমার কিছুটা ভয় হয়। আমি জানি তাদের ধৈর্যের বড় অভাব, তারা বোকার মত কোন কিছু করে ফেলতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যুবকেরা কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দেয়।'[৩৪] অপরদিকে গান্ধীজীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল কালহরণ করা। অনেকের মতে তিনি ব্রিটিশ সরকার এবং অন্যান্য ভারতীয় দলগুলি কি করে তা দেখতে চাইছিলেন। কারণ, তাদের কাজের পদ্ধতিকে পুঁজি করে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি ব্যর্থ হন। কারণ ব্রিটিশ সরকার বা সংখ্যালঘু দলগুলি কেউই গান্ধীজীর আশা অনুযায়ী কোনো ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার অবস্থায় ছিল বলে মনে হয় না।[৩৫]

অন্যদিকে জিন্না ভারতের সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা হবার অভিপ্রায়ে এবং পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলমান নেতাদের বশে আনবার জন্যে ১৯৪০ সালে পাকিস্তান দাবিকেই একমাত্র দাবি করে তোলেন। কিন্তু সরকার তখন জিন্নার আশা পূরণের জন্যেও কোনো ব্যগ্রতা না দেখাবার ফলে এই বছরের শেষদিকে মুসলিম লীগও কার্যত একটা অচলাবস্থায় এসে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাঁর পাকিস্তান-সম্পর্কিত দাবির উগ্রতার জন্যেও জিন্না এই সময়ে একটা রাজনীতিক সুযোগ হারান। কংগ্রেস যে নিজেকে ভারতীয় জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করে তার বিরুদ্ধে শুধু মুসলিম লীগ নয়, অন্যান্য সংখ্যালঘু দলও ছিল। তারা মিলিতভাবে কংগ্রেসবিরোধী ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেবার জন্যে জিন্নার কাছে আবেদন করে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনো দাবিই তিনি তখন শোনার মত অবস্থায় ছিলেন না।[৩৬]

ফরওআর্ড ব্লক, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি বামপন্থী সংগঠনের পক্ষেও গান্ধীজী এবং কংগ্রেসী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনগণকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টে সমবেত করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। এই দলগুলির সংগঠনও এই বিরাট দায়িত্বের জন্যে উপযুক্ত বিশালতা বা দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেনি। ফলে ১৯৪১ সালের জানুআরি মাসে এই দুটি দলের প্রতিনিধিরা লখনৌতে আচার্য কৃপালনীর সঙ্গে দেখা করে গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু একথাও তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে তাঁরা কংগ্রেস হাই কমাণ্ড অথবা সংগঠনকে কোনভাবেই দুর্বল করতে চান না। তাঁদের সমস্ত

CENTRAL LIBRARY

আবেদনই অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।[৩৭] এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসু স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় ভারত থেকে গোপনে ইওরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁর অনুপস্থিতির ফলে তাঁর দলের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং অপরদিকে দেশবাসী হারায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভূত সম্ভাবনাময় এক বামপন্থী নেতাকে।

কংগ্রেস রাজনীতিতে তখন যে নৈরাজ্য এবং স্থিতিশীল প্রবণতা দেখা দেয় তার ছাপ প্রাদেশিক রাজনীতির উপরেও পড়ে। কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করার পরেও উত্তর প্রদেশে প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আঞ্চলিক স্তরে নির্বাচনে অংশ নেয়। মহাকোশল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হাইকমাণ্ডের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন করে।[৩৮] তবে এই রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী মানসিকতাকে গুলিয়ে ফেললে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, ভুলাভাই দেশাই, সত্যমূর্তি প্রমুখ নেতারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস ও আইন সভায় পুনর্প্রবেশের জন্যে এই সময়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষ দিকে যুদ্ধের অবস্থা আরও ঘোরালো ও ব্যাপক হয়ে ওঠে, কারণ জাপান যুদ্ধে যোগ দেয় এবং দক্ষিণপূর্ব এশিআয় রণাঙ্গন বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ডিসেম্বর মাসে ওআর্কিং কমিটি এবং সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর ধারণা ছিল কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজী হলে সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অহিংসার কারণেই যুদ্ধে যোগদান করা উচিত নয়। অপরদিকে আজাদ প্রমুখ নেতারা স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেলে যুদ্ধে সহযোগিতা করার পক্ষে ছিলেন।[৩৯] এই কারণে যে বিরোধ দেখা দেয় গান্ধীজী তার ফলে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করেন।

ক্রিপস মিশন :—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ রাজনীতিক নেতা ও কূটনীতিবিদ্ স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন। এই সময়ে ওআর্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বৈঠক চলছিল। প্রধানত কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের চেষ্টায় ক্রিপসও এই সময়ে ওআর্ধা যান। সরকারের সঙ্গে আপস চুক্তির একটা সূত্র বার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

CENTRAL LIBRARY

মৌলানা ক্রিপসকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে ভারতের স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার মেনে নিলে যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতা সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবকেই জনগণ গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে বেশী গুরুত্ব দেবে। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর প্রতি সকলের অবিচল শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বড় অংশ যে গান্ধীজীর বদলে আজাদের বক্তব্যই মেনে নেবেন এতেও মৌলানার কোনো সন্দেহ ছিল না।[৪০] মনে হয় কংগ্রেসের মধ্যে রাজাগোপালাচারী প্রমুখ নরমপন্থী নেতারা আপসের পক্ষে থাকলেও আজাদ প্রধানত আন্তর্জাতিকতাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা ফ্যাসিবিরোধী জওহরলাল নেহরুর সাহায্য লাভের উপরে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া, কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সুভাষচন্দ্রের বিতাড়ন ঘটার পরে জওহরলালই ছিলেন সবচেয়ে তরুণ, জনপ্রিয় এবং বামপন্থী ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তির অধিকারী।

এই আলোচনার শেষে স্যর স্ট্যাফোর্ড একটি স্মারকলিপি (aide memoire) তৈরি করেন। এতে বলা হয় ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে এই মর্মে একটি বিবৃতি দেবেন যে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হবে। এ কথাও ঘোষণা করা হবে যে ভারত ভবিষ্যতে কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কিনা সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও এককভাবে ভারতের থাকবে। যুদ্ধ চলাকালে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মন্ত্রীর সমান মর্যাদা হবে। ভাইসরয় নিজে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে থাকবেন। এইভাবেই কার্যত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। আইনগত হস্তান্তর যুদ্ধের পরে হবে।[৪১] ক্রিপস-প্রস্তাবিত আপসের সূত্রগুলি যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যে পুরো মেনে নিয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবুও প্রধানত মার্কিন চাপে ১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ভারতে ক্রিপস মিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতে ক্রিপস মিশনের আগমনকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একদিকে কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি দলগুলো পুরনো বন্ধুকে স্বাগত জানাতে উৎসুক ছিলেন, অপর দিকে বামপন্থীরা সাধারণভাবে ছিলেন এই মিশনের বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র বসুও জার্মানী থেকে বেতার ভাষণে ভারতবাসীকে এই টোপ গেলার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেন। ক্রিপস যে পুরনো ভেদনীতিকেই কাজে লাগাতে আসছেন এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন।[৪২]

CENTRAL LIBRARY

ক্রিপস ভারতে আসবার আগেই কংগ্রেস ছাড়াও মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রতিনিধি খান বাহাদুর আল্লা বক্স প্রমুখের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেন। কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠক হয় ২৯ মার্চ। এই বৈঠকে ক্রিপস সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা তৈরী ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করেন। এর ফলে ব্রিটিশ অফিসাররা যে সেক্রেটারী হিসেবে থেকে যাবেন সে ব্যাপারটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের সেক্রেটারী অব স্টেটের (ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী) অবস্থান হবে ডোমিনিয়ন সেক্রেটারীর মতো একথাও বলা হয়। দুই পক্ষই এই বৈঠক সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন।

২৯ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল (১৯৪২) পর্যন্ত দীর্ঘ চোদ্দ দিন একটানা কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির বৈঠক চলেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে ওআর্কিং কমিটির এই অধিবেশনের গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। এই অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই গান্ধীজী ক্রিপস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। এর অন্যতম কারণ ছিল তাঁর যুদ্ধবিরোধী অহিংসাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। যার ফলে কোন কারণেই যুদ্ধে সহযোগিতাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের শেষে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে এই মর্মে ক্রিপসের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেননি। ক্রিপসের সঙ্গে এই সময়ে বৈঠকে মাঝে-মাঝেই গান্ধীজীর তীব্র কথা কাটাকাটিও হয়।[৪৩] অধিকাংশ কমিটি সদস্যেরই খুব গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব মতামত ছিল না। তাঁরা গান্ধীজীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রাজাগোপালাচারীকে এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্রিপস প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ওআর্কিং কমিটিতে তাঁর বক্তব্যে কেউই খুব গুরুত্ব দেননি। বস্তুত জওহরলাল নেহরুই এই সময়ে সবচেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েন। দেশের জনমত তখন খোলাখুলিভাবে এবং প্রবলভাবে ব্রিটিশবিরোধী থাকায় তিনি প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে থাকলেও সে কথা জোরের সঙ্গে বলার সাহস পাচ্ছিলেন না।[৪৪] কারণ তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে ওআর্কিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ভাইসরয় যে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানের ভূমিকা পালন করবেন এ কথা চুক্তির মাধ্যমেই স্পষ্টাক্ষরে লেখার কথা ক্রিপসকে জানানো

CENTRAL LIBRARY

হবে। সেই হিসাবে ১ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ আবার ক্রিপসের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর এই দ্বিতীয় বৈঠক এবং ২ এপ্রিল থেকে পরবর্তী সব বৈঠকই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ ক্রিপস দ্ব্যর্থহীনভাবে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে অপারগ হন। বরং উলটো দিকে আর কোন শর্ত আরোপ না করে বা বেশী ব্যাখ্যা না চেয়ে চুক্তিপত্রের অভিহিত মূল্য (face value) অনুযায়ী সেটি গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এর ফলে ভাইসরয়ের ক্ষমতা, ইণ্ডিআ অফিস এবং সেক্রেটারী অব স্টেটের ভূমিকা, ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সদস্যের ক্ষমতা, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন, দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত ইউনিঅনে যোগ দেওয়া সম্পর্কে যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা প্রভৃতি সবই অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে যায়। উপরন্তু, ক্রিপস মিশনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির সমালোচনাকে স্যর স্টাফোর্ড 'হিন্দু প্রেস'-এর কাজ বলে বর্ণনা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকাবার চেষ্টা করেন। সর্বোপরি, যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের স্বাধীনতার যে কোনও সম্ভাবনা নেই সেটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। এর ফলে দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ বাক্-বিতণ্ডার পরে ওআর্কিং কমিটি ১১ এপ্রিল প্রস্তাব গ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে ক্রিপস মিশনকে প্রত্যাখ্যান করে।

যদিও কংগ্রেস সভাপতি প্রেস কনফারেন্সে জানান যে এই সিদ্ধান্ত ওআর্কিং কমিটিতে প্রতিটি স্তরে সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে তবুও জওহরলাল নেহরু 'নিউজ ক্রনিকল্' পত্রিকায় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেকার পার্থক্যকে খুবই তাৎপর্যহীন করে দেখান এবং বলেন যে যদিও কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে তাহলেও ভারত ব্রিটেনকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। উপরন্তু তিনি অল ইণ্ডিআ রেডিও থেকেও এই মর্মে বিবৃতি দেবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি বহু তর্কবিতর্কের পরে তাঁকে কোনো বিবৃতি না দেবার ব্যাপারে রাজী করান।[৪৫]

ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাকে রাজাগোপালাচারী সমর্থন করেননি। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খোলাখুলি বলতে থাকেন যে কংগ্রেস যদি ক্রিপস প্রস্তাব এবং লীগের প্রস্তাব মেনে নিত তাহলে স্বাধীনতার পথ সুগম হত। তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। বরং মাদ্রাজ কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির থেকে একটি প্রস্তাব পাস করান। এই প্রস্তাবে সারা ভারত কংগ্রেস

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

CENTRAL LIBRARY

কমিটিকে মুসলিম লীগের ভারত বিভাগের দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করা হয়। এর ফলে কংগ্রেস মহলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মৌলানা আজাদ রাজাগোপালাচারীকে প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বলেন। রাজাগোপালাচারী তাতে অসম্মত হন এবং সেই কারণে ৩০ এপ্রিল ওআর্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন।

CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় অধ্যায়

বামপন্থীদের ভূমিকা

১৯৩৭-৪১

তিরিশের দশকের শেষ থেকে ভারতে বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিরোধ অনেক খোলাখুলি চেহারা নেয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অবস্থায় এই দ্বন্দ্বের গভীরতা ও ব্যাপ্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাম ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে বিরোধের একটি প্রধান বিষয় ছিল বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সরকারকে সহযোগিতা করার প্রশ্নটি। অপর বড় প্রশ্নগুলি ছিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রহণ করা এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে ভবিষ্যতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা এবং তৎকালীন পরিবেশেই যতদূর সম্ভবপর কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বাধীন প্রদেশগুলিতে এই সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো ইত্যাদি। স্বাধীনতার দাবিতে আবার গণ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নে কংগ্রেস প্রধান দুটি বিপক্ষ শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। সংগ্রাম শুরু করা সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত যদিও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মতামতের থেকে ভিন্ন ছিল না, তবে যুদ্ধে সরকারকে সহযোগিতার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যে দক্ষিণ ও বামপন্থী কোনও নেতার (একমাত্র তাঁর চূড়ান্ত অনুগামীদের কথা বাদ দিলে) দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এক ছিল না তা আমরা দেখেছি।

কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যেও এই প্রশ্নে কোনো ঐকমত্য ছিল না এবং এর ফলেই বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্যে কোনও ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে তুলতে পারেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রথমে নাৎসী জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েতের অনাক্রমণ চুক্তি (২৩ অগস্ট ১৯৩৯) এবং পরে চুক্তি ভঙ্গ করে নাৎসী জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিঅন আক্রমণ (২২ জুন ১৯৪১) এবং সোভিয়েত ইউনিঅনের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মিত্রশক্তিতে যোগদান পৃথিবীর সব দেশেই এবং বিশেষত পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে তাদের ভূমিকাগত প্রশ্নে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট

CENTRAL LIBRARY

পার্টির (সি. পি. আই) পরস্পরবিরোধী এবং দুর্বল অবস্থান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিরাট ছায়াপাত করেছিল। হিটলার সোভিয়েত ইউনিঅন আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের জুন মাসের মাঝা-মাঝি, ভারতের বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি মূলত দুটিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্যায়ভুক্ত দলগুলি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং নানাভাবে এই যুদ্ধকে প্রতিরোধ ও বিরোধিতার প্রচার চালায়। এই পর্যায়ে অধিকাংশ বামপন্থী সংগঠন পড়ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফরওআর্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। এছাড়া এই সময়ে গড়ে ওঠে আরো কিছু ছোট গোষ্ঠী ও দল। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত ছিল একটি মাত্র দল, যারা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে মনে করত না এবং যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্যেই প্রচার চালিয়েছিল। এই দলটি হল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী গোষ্ঠী যা সেই সময়ে 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি' নামে পরিচিত ছিল। নীচে প্রধান গোষ্ঠী ও দলগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

ফরওআর্ড ব্লক :—১৯৩৯ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'একই পতাকাতলে বামপন্থী সমস্ত দলকে একত্র করা'র উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ভিতরে আমল পরিবর্তনকামী ও প্রগতিশীল একটি মঞ্চ হিসেবে প্রথমে ফরওআর্ড ব্লক আত্মপ্রকাশ করে।[১] প্রথম থেকেই ফরওআর্ড ব্লকের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম।' অপরদিকে 'বাস্তব বৈদেশিক নীতি ও সমাজবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন'কে ফরওআর্ড ব্লক সমর্থন করেছিল।[২] ইওরোপে যুদ্ধের সূত্রপাত থেকেই ফরওআর্ড ব্লক এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। যুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে অবিলম্বে জাতীয় স্তরে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে এই দল এবং দলের নেতা সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রচার চালাতে শুরু করেন।[৩] এই দাবিকেই জাতীয় দাবি হিসেবে দলের পক্ষ থেকে জনগণের সামনে উত্থাপন করা হয়। একই সঙ্গে এই দল কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী তথা দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে এই কারণে যে নেতৃবৃন্দ আপসপন্থী এবং দোদুল্যমান মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে এবং অকর্মণ্যতার পথ ধরে চলছেন। বিশেষ করে নেহরুর একই সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসপন্থী দ্বিমুখী আচরণের সুভাষচন্দ্র তীব্র সমালোচনা করেন।[৪]

CENTRAL LIBRARY

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিকে যদিও দলের পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয় যে সম্মানজনক শর্তে অনুষ্ঠিত হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনায় আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে ফরওআর্ড ব্লক তার আপসবিরোধী সংগ্রামের প্রচার জোরদার করে তোলে। (৫) বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে ১৯৩৯ সালে ফরওআর্ড ব্লকের এবং অন্যান্য দলের উদ্‌যোগে বোম্বাইয়ে বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটি সংযুক্ত এবং সুসংগঠিত ফ্রন্ট হিসেবে উপস্থিত হতে পেরেছিল। এবং নাগপুরে এই বছরের অক্টোবর মাসে এই কমিটির উদ্‌যোগে একটি সফল আপসবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এর অব্যহিত পরেই ওআর্ধায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির যে বৈঠক বসে সুভাষচন্দ্রকে ঐ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফরওআর্ড ব্লকের পক্ষে তাঁর বক্তব্য ছিল যে তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া উচিত। এই কথা তিনি পরিষ্কারভাবে জানান যে: ওআর্কিং কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ফরওআর্ড ব্লক মনে করে দেশের প্রকৃত স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তার আছে।[৬]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আপসপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে ফরওআর্ড ব্লক প্রচারের চূড়ান্ত পর্বে এই নেতৃত্বের অপসারণের দাবি জানায় এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিবর্তে একটি বামপন্থী কংগ্রেস গঠনের প্রস্তাব দেয়। একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র পুরো কংগ্রেসকে সঙ্গে না পেলে তাকে বাদ দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপসহীন সংগ্রাম শুরু করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন।[৭] কংগ্রেস তখন আন্দোলন শুরু না করার স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখাচ্ছিল—জনগণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়, দেশে হিংসা এবং সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব রয়েছে ইত্যাদি—ফরওআর্ড ব্লকের মতে তার মূল কারণ ছিল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেউলিয়াপনা এবং সংগ্রাম শুরু হলে নেতৃত্ব হারাবার ভয়।[৮]

ফরওআর্ড ব্লকের আরও অভিযোগ ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের থেকেও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বৈরিতা এই দলকে আরও অসুবিধায় ফেলেছে।[৯]

সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার বক্তব্য থেকে একথা কখনও কখনও মনে হয় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকেও কংগ্রেস-নেতৃত্ব বিপ্লবী বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কাছে আরও বড় শত্রু ছিলেন।[১০] কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে যে গণ-পরিষদ বা সংবিধান সভা আহ্বানের দাবি জানানো হয়েছিল

ফরওআর্ড ব্লক তাকে 'ভুয়ো সংবিধান সভা' বলে অভিহিত করে।[১১] এবং সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাবে জানান যে কেবল স্বাধীনতার পরেই যথার্থ সংবিধান সভা আহ্বান করা যেতে পারে। নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত এই সভা যে কার্যত জাঁকজমকপূর্ণ সর্বদলীয় সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই হবে না এ কথাও তাঁরা বলেন।[১২]

১৯৩৯ সালের জুলাই মাস থেকে ফরওআর্ড ব্লকের সঙ্গে ক্রমেই অন্য বামপন্থী দলগুলির সম্পর্কের অবনতি দেখা দিতে থাকে এবং বামপন্থী সংহতি কমিটিতে ভাঙ্গন শুরু হয়। সর্বপ্রথম মানবেন্দ্রনাথ রায় ঘোষণা করেন যে তাঁর দল বামপন্থী সংহতি কমিটির কর্মসূচী অনুযায়ী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবসে অংশ নেবে না। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে 'রায়-পন্থীদের যুদ্ধকালীন ভূমিকা' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। এর পরে অক্টোবর মাসে লখনৌয়ে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে এর পর থেকে ঐ দল সংহতি কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী চলবে না, বরং স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবে। ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে কার্যরত কমিউনিস্ট পার্টিও ফরওআর্ড ব্লকের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে। ফলে দুটি দলের মধ্যে বিরোধ এবং তিক্ততার সৃষ্টি হয়।[১৩] এবং কমিউনিস্টরা বামপন্থী সংহতি কমিটি ত্যাগ করেন।

ফরওআর্ড ব্লকের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল যে এই দুটি দল দক্ষিণপন্থী শিবিরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অপরদিকে এই দুটি দল ফরওআর্ড ব্লক সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলে যে সুভাষচন্দ্র বসুর নীতির ফলে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরবে, কিন্তু ঐ দল দুটির মতে কংগ্রেসের ঐক্যকে রক্ষা করা জাতীয় সংগ্রামের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। কমিউনিস্টরা আরও একধাপ এগিয়ে একথাও বলেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র অকর্মণ্যতার জন্যে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করেন, কিন্তু তিনি নিজেও অগ্রসর হবার মত কোন পদক্ষেপ নেননি। এ কথার তাৎপর্য হল এই যে আঞ্চলিক সংগ্রামের বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় সংগ্রামে উত্তরণ সম্পর্কিত কমিউনিস্টদের ধারণাকে সুভাষচন্দ্র গুরুত্ব দেননি। কিন্তু কমিউনিস্টদের বক্তব্য ছিল যে নাগরিক স্বাধীনতা প্রভৃতির দাবিতে কোথাও এরকম আন্দোলন শুরু হলে ক্রমে তা ব্যাপক রূপ নেবে এবং অবস্থার চাপেই কংগ্রেসকে সেই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে হবে। যাই হোক, ফরওআর্ড ব্লকের বিরুদ্ধে

CENTRAL LIBRARY

সমালোচনা করে কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী মুখপত্রে তাকে 'পাতি-বুর্জোআ শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী সংগঠন' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। এর পরেই দুটি দলের মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে।[১৪]

এর পর ফরওআর্ড ব্লকের পক্ষ থেকে একটি আপসবিরোধী কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের পাশাপাশি একটি আপসবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে ফরওআর্ড ব্লক ছাড়াও সারা ভারত কিষাণ সভা যোগ দেয়। বিহার কিষাণ সভার জনপ্রিয় নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী সম্মেলনে একটি বিশাল কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেন। বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা করার দিক থেকে এই আপসবিরোধী সম্মেলন যথেষ্ট সফল হয়েছিল কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এই সম্মেলনে যোগ দেয়নি। এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা দিবসের প্রতিজ্ঞাপত্রে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব নতুন করে চরকা, গঠনমূলক কর্মসূচী, দলীয় শৃঙ্খলা প্রভৃতির উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র তার কঠোর সমালোচনা করেন। এই সম্মেলনে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সারা ভারত কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

অপরদিকে ফরওআর্ড ব্লকের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম অচিরে শুরু করার জন্যে অন্যান্য দলকেও বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লীগ নেতা জিন্না সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান হাসিল করার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে উৎসাহী ছিলেন। ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব নিয়ে লীগের সঙ্গে আলোচনায় ব্লক সফল হতে পারে নি। এদিকে হিন্দু মহাসভাও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা করার নীতি গ্রহণ করে। কারণ, ঐ দল এইভাবে হিন্দুদের ব্রিটিশ সৈন্যদলে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। হিন্দুদের পক্ষে সামরিক শিক্ষালাভ করাকে দলের নেতারা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। ফলে হিন্দু মহাসভার দিক থেকেও ব্লক হতাশ হয়েছিল।[১৫]

রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর থেকেই ফরওআর্ড ব্লকের বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এই দলের বহু বিশিষ্ট

CENTRAL LIBRARY

নেতাকে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। দেশজোড়া এই দমনের মুখে দাঁড়িয়ে ফরওআর্ড ব্লকও সংগ্রাম জোরদার করে। এই বছরের ৬ থেকে ১৩ এপ্রিল ফরওআর্ড ব্লক দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় সপ্তাহ পালন করে। এর মধ্যে ১৯৪০ সালের জুন মাসে নাগপুরে ফরওআর্ড ব্লকের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে সরকারী দমন ব্যবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে দলের সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ঐ বছরের জুলাই মাসের শুরুতে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা সাতদিন অনশনের পরে আশংকাজনক হয়ে উঠলে তাঁকে কলকাতায় স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এই অবস্থায় কড়া পুলিস পাহারায় চল্লিশ দিন কাটানোর পরে তিনি ১৯৪১ সালের ১৭ জানুআরি মধ্যরাতে গোপনে গৃহত্যাগ করতে সমর্থ হন। ব্রিটিশ পুলিসবাহিনী বহু চেষ্টাতেও তাঁকে ধরতে পারেনি, এবং দুঃসাহসিকভাবে তিনি কাবুল হয়ে ইটালীর পথে জার্মানী পৌছান। [তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম 'আজাদ্ হিন্দ আন্দোলন' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য]। নেতার অনুপস্থিতির সময়ে ফরওআর্ড ব্লক কর্মীরা ভারতের বাইরে তাঁর কর্মসূচীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ১৯৪২ সালের অগস্ট সংগ্রামে যোগ দেন। দলের অধিকাংশ কর্মী ও নেতাই যুদ্ধ চলাকালীন বছরগুলিতে কারারুদ্ধ ছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ফরওআর্ড ব্লকের ভূমিকা ছিল কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সামাজিক মতাদর্শগত দিক থেকে ব্লক কোনো সময়েই একটি সমচিন্তা-ভিত্তিক সংগঠন ছিল না এবং সুস্পষ্টভাবে এর কোনো মতাদর্শগত তত্ত্বও গ্রথিত করা হয়নি।

সূচনাপর্বে ফরওআর্ড ব্লক একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ হওয়াতেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল। অপরদিকে সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের যুগে তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করাকেই বামপন্থা হিসেবে চিহ্নিত করায় প্রারম্ভিক পর্যায়ে মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দেয়নি। নেতিবাচক দিক থেকে বলা চলে সাম্রাজ্য-বাদের পাশাপাশি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী মনোভাব ঐ দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়তা করেছিল।[১৬]

কমিউনিস্ট পার্টি : ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলার সোভিয়েত ইউনিঅন আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির মতই এই যুদ্ধকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সেই

সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করার উপরে কমিউনিস্ট পার্টি সবচেয়ে বেশী রাজনীতিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল। যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ধারণ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিঅনের ভূমিকা এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যের দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত ছিল। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের শুরু থেকেই একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা নেয় এবং এই পর্বে যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে। ভারতকে জোর করে যুদ্ধের সঙ্গে জড়াবার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকাকে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি নিন্দা করে এবং অন্য আরও কয়েকটি বামপন্থী গোষ্ঠীর মতই ভারতজোড়া তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে প্রচার চালায়।

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস নেতৃত্ব, কংগ্রেস দল ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিক শক্তিসমূহ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন এবং দলের ভূমিকা প্রভৃতি আলোচিত হয়। প্রস্তাবে এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। বলা হয় যুদ্ধের সংকটকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে শান্তি, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বিপ্লবী শক্তিসমূহ অনেক বেশী বলশালী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। নীচে প্রস্তাবের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

জাতীয় স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধজনিত সংকটের বৈপ্লবিক ব্যবহার—বর্তমানে জাতীয় শক্তিসমূহের এটাই হল কেন্দ্রীয় কর্তব্য···যুদ্ধের সংকট ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিরোধকে সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে এবং আরও হাজার গুণ তীব্র করেছে···যুদ্ধপ্রস্তুতির প্রতি বিরোধিতা বাড়ছে। সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে।···

এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত করার পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতকে সমগ্র জাতীয় সংগ্রামের সামনে নিয়ে আসতে হবে। ক্ষমতা দখল করা হল এখন আশু বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য—যে লক্ষ্যের জন্যে এই মুহূর্ত থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।[১৭]

ঐ প্রস্তাবে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে

CENTRAL LIBRARY

অভিযোগ করে বলা হয় যে তাঁরা গণ-সংগ্রাম শুরু করতে ভয় পাচ্ছেন অপরদিকে যুদ্ধের সংকটকে সরকারের সঙ্গে দরাদরির কাজে ব্যবহার করেছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বকে প্রধানত চারটি দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি তীব্র সমালোচনা করে। এর ভিতর প্রথমটি দোদুল্যমানতা, দ্বিতীয় আপসপন্থী মনোভাবের পরিচয় দেওয়া, তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে শর্তাধীনে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং চতুর্থ আশু গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত না হওয়া। গান্ধীবাদ ক্ষয়িষ্ণুতার স্তরে পৌঁছেছে এবং জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে শৃংখল হিসেবে কাজ করছে—এটাই ছিল গান্ধীবাদ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মূল্যায়ন। যুদ্ধের প্রথম পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির শ্লোগান ছিল 'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, শান্তি' এবং দলের দাবি ছিল ভারতে গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন ও গণফৌজ গঠন। এই সময়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হলেও সংগঠন হিসেবে কংগ্রেসের সমালোচনা করা হয়নি। যেমন ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে একে বুর্জোআ সংগঠন হিসেবে মনে করা হয়েছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে বরং জাতীয় সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকাকে এত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে এই সংগঠনের ঐক্য এবং জাতীয় ঐক্যকে এক করে দেখা হয়েছিল।[১৮]

শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু এবং ফরওআর্ড ব্লকের সঙ্গে বিরোধ এবং ঐ দলের কঠোর সমালোচনার মূল বক্তব্য এটাই ছিল যে ফরওআর্ড ব্লক কংগ্রেসের ঐক্য নষ্ট করছে যা কোনমতেই হতে দেওয়া যায় না।

কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৪ সালের জুন মাসে বে-আইনী ঘোষিত হয়। এর পর থেকে এই দল 'ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট' নামে কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠী গঠন করে সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামী ভূমিকায় নামাবার কর্মসূচী অনুযায়ী প্রথম ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের (৯০,০০০ জন) একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট সংগঠিত করা হয়। এই সময়ে দলের নেতৃত্বে আর যে সমস্ত ধর্মঘট হয় তার মধ্যে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে বোম্বাই সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট, বিহারের চিনিকল শ্রমিক ধর্মঘট, কলকাতার বন্দর শ্রমিকদের ও ঝরিয়ার কয়লাখনি শ্রমিকদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। একই সময়ে কিষাণ সভার উদ্‌যোগে জঙ্গী কৃষক আন্দোলনও ব্যাপ্তিলাভ করে। এই সব ধর্মঘটের অনেকগুলিই আর্থনীতিক কারণে সংগঠিত হলেও পার্টির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এই সমস্ত ধর্মঘটের মাধ্যমেই সাধ্যমত করা হয়। অপরদিকে, জাতীয়

কংগ্রেসের নেতৃত্ব যে এই ধর্মঘটগুলিকে সমর্থন জানায়নি এজন্যে তাঁদের নিন্দা করা হয়।[১৯]

কংগ্রেসের মধ্যে কার্যরত বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শুধু যে ফরওআর্ড ব্লকের সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ এবং বিচ্ছেদ ঘটে তা নয়, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গেও এই দলের সম্পর্কের একই পরিণতি ঘটে। এই দলের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মতপার্থক্য এবং বিরোধকে প্রধানত তিনটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, কমিউনিস্টরা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিকে একটা গণ দলে (mass party) পরিণত করার পক্ষে চাপ দিতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষা করে তার মধ্যে থেকে সংগ্রাম করার জন্যে সংযুক্ত মার্কসবাদী দল গঠন অপরিহার্য। এই দল গঠনের পূর্ব শর্ত তাঁদের মতে ছিল সি.এস.পি-কে গণ দলে রূপান্তরকরণ। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীকে কমিউনিস্ট পার্টি চিহ্নিত করেছিল; অপরদিকে সি. এস. পি-র তত্ত্ব অনুযায়ী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাই এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে। তৃতীয়ত, কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় সংগ্রাম জাতীয় বিপ্লব তথা স্বাধীনতা লাভেই শেষ হবে না, সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে অবিচ্ছিন্নভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যের অভিমুখে। অপরদিকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা দুটি প্রশ্নকে একসঙ্গে বিচার করতে প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁদের মতে সমাজতন্ত্রের প্রশ্ন কেবল স্বাধীন ভারতেই উঠতে পারে, পরাধীন ভারতে বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন।[২০]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এই সময়কার বক্তব্যে ও আচরণে একটা পরস্পর বিরোধ লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ অগস্ট সংগ্রামের সময়ে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমর্থক হয়ে ওঠে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করতে থাকে, তার সঙ্গে এই পরস্পর বিরোধ ও অসংগতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত "কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি অ্যাণ্ড দ্য ওয়ার" নামক পুস্তিকায় একদিকে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীবাদ যে তার সর্বশেষ এবং সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে প্রবেশ করেছে—একথা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়। যুদ্ধে সহযোগিতার প্রশ্নে আপসমুখী

মনোভাবই হল জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং গান্ধীবাদ সেই আপসের নীতি—এ কথা ঐ পুস্তিকায় বলা হয়। পাশাপাশি একই সঙ্গে বলা হয় যে এসব সত্ত্বেও গান্ধীবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত কংগ্রেসকে ত্যাগ করা যাবে না। বরং তার মধ্যে থেকে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। কিন্তু কার্যত এই সংগ্রাম চালাবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং কার্যত নেতৃত্বের সঙ্গে আপসের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এরকম একটি উদাহরণ হল কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিনা প্রতিবাদে পূর্ববর্ণিত স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা। সংগ্রামের বদলে গঠনমূলক কর্মসূচীর শপথ এবং গান্ধীবাদী নীতি ও আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞা এই অঙ্গীকার-পত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত করে ছিলেন। এটি গ্রহণ করার জন্যে কর্মীদের উপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টিও করা হয়। কংগ্রেস সোস্যালিস্টরা এটি গ্রহণে অসম্মতি জানান।[২১]

দল বে-আইনী থাকায় ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে গোপন পার্টি সংগঠনের মাধ্যমে কাজ চালানো হতে থাকে, কিন্তু প্রাদেশিক স্তরে পার্টি ভাল গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত পার্টির বহু কর্মীকেই কয়েক বছর কারাবাসে থাকতে হয়েছে, পরে পর্যায়ক্রমে তাঁরা মুক্তি পান।

কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি : সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে বামপন্থী-দের একটি গোষ্ঠী হিসেবে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বা সি. এস.পি-র প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই দল দু ধরনের দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হয়। একদিকে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব, অপরদিকে মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদের দ্বন্দ্ব। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে, এই দ্বন্দ্ব দলের বক্তব্যকেই শুধু অস্পষ্ট করেনি—দলের জনপ্রিয়তা ও সংগঠনেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে।

১৯৩৪ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করা হবে এবং জাতীয় সংগ্রাম তীব্রতর করে তোলার কাজে এই ধরনের যাবতীয় সংকটের সুযোগকে ব্যবহার করা হবে। যুদ্ধের প্রথম থেকেই এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে দলের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়। সেই সঙ্গে এই যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার কর্মসূচীও নেওয়া হয়। দলের যে শ্লোগান যুদ্ধের

CENTRAL LIBRARY

সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তা হল 'ন এক পাই, ন এক ভাই অংরেজকো লড়াইমে।'

১৯৩৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দলের জাতীয় পরিচালকমণ্ডলীর সভায় প্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে দলের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা হয়। এর পরে ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দলের সাধারণ সম্পাদক ছুটি যুদ্ধ-সংক্রান্ত সার্কুলার প্রচার করেন। এগুলিতে যে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে নিঃশর্ত বিরোধিতার কথা ছিল শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে কোন রকম দরকষাকষির মধ্যে না গিয়ে এবং এই যুদ্ধের লক্ষ্যের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা না করেই অবিলম্বে গণ-সংগ্রাম শুরু করার কথা বলা হয়েছিল। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির ওআর্ধা বৈঠকের সময়েও এই প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং বলা বাহুল্য যে তা বাতিল হয়ে যায়।

জাতীয় পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয় :—(১) প্রবলভাবে যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাওয়া এবং সভা, সমাবেশ, মিছিল এবং রাজনীতিক কারণে ধর্মঘটকে এই প্রচারের অন্তর্ভূক্ত করা, (২) কংগ্রেস কমিটিগুলিকে যুদ্ধবিরোধী কাজের মধ্যে টেনে আনা, (৩) ব্যাপকভাবে প্রচার কাজের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা।

রামগড় কংগ্রেসে নেতৃবৃন্দ পরিবেশের চাপে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে সংগ্রাম অপরিহার্য। সি. এস পি এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। ইতঃপূর্বে সংগ্রামের পথ না নেবার জন্যে তাঁরা কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করতেন। কিন্তু ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয় সেখানে শর্ত সাপেক্ষে এ যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব নেওয়া হয়। একই সময়ে ঐ জায়গাতেই সি.এস.পি-র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে এ. আই. সি. সি.-র প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় এবং শর্তহীনভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে বাধা দেওয়ার নীতির স্বপক্ষে বলা হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয় : "ব্রিটেন ভারত সম্পর্কে যে ঘোষণাই করুক না কেন, তা সত্ত্বেও ব্রিটেন একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং এই যুদ্ধ একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে যাবে।" দলের একজন নেতা মেহেরআলি বিহার সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে বলেন যে প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রীরা বলে আসছে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না এবং এই যুদ্ধকালীন সংকটই সে ব্যাপারে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস-নেতৃত্বের সমালোচনা করলেও কংগ্রেস ভাগ করা

CENTRAL LIBRARY

অথবা এর নেতৃত্বের কঠোরতম সমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। বস্তুত পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই তাঁরা কংগ্রেস-নেতৃত্বের সমালোচনা করেন—তার অপসারণ দাবি তাঁরা করেন নি। তাঁদের যুক্তি ছিল যে কংগ্রেসের ঐক্য জাতীয় সংগ্রামের জন্যে অপরিহার্য হওয়ায় কংগ্রেসের ঐক্য বিঘ্নিত করা চলবে না। অপরদিকে কংগ্রেসের ঐক্য মানে কংগ্রেস নেতৃত্বের ঐক্য—একথাই তাঁরা মনে করতেন। সুতরাং তাঁদের পরিকল্পনা ছিল বাম অথবা দক্ষিণ নিরপেক্ষভাবে সমগ্র কংগ্রেসকে স্বমতে নিয়ে আসা। এই কারণেই গান্ধী-নেতৃত্ব ও গান্ধীবাদের নেতিবাদ সমালোচনা তাঁরা পছন্দ করতেন না, যার ফলে অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনের দ্বারা তাঁরা গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের কাছে আত্মসমর্পণ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মতে এটা অবশ্য আত্মসমর্পণ ছিল না, ছিল বাস্তবানুগ পন্থা।

অপরদিকে একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাঁদের কাছে আশু লক্ষ্য ছিল না। জাতীয় স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের আশু লক্ষ্য। সেই কারণে তাঁদের মতে সমাজতন্ত্রী, গান্ধীবাদী এবং অন্য সবাই জাতীয় বিপ্লবের অংশীদার। এর ফলে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ক্রমেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে—এই অভিযোগের কোন বিশ্বাসযোগ্য জবাব নেতারা দিতে পারেন নি। এই ভাবে সি. এস পি. ধীরে ধীরে দলের আদি ধারণার কয়েকটি মূল ভিত্তি ত্যাগ করতে থাকে অথবা বাস্তব রাজনীতিতে তার প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। এই ধরনের কয়েকটি মূল ধারণার একটি হল যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মসূচীর যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে না পারলে কোনো জাতীয় সংগ্রামই সফল হবে না। দ্বিতীয়ত, যে-কোনো আন্দোলনের সাফল্যের অন্যতম শর্ত হল এই আন্দোলনে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ও কৃষক জনগণের অংশগ্রহণ। তৃতীয়ত, জাতীয় সংগ্রামের জন্যে নতুন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন কিন্তু এর কোনোটির ক্ষেত্রেই দল কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেনি। দলের নেতারাও একথা ভালোভাবে জানতেন। ফলে এই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ দলের নেতা হিসেবে স্বীকার করেছিলেন যে "১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেসের কর্মসূচী বলতে আজ অবধি গান্ধীজী প্রদত্ত কর্মসূচীকেই বোঝায়। কার্যত দলের (কংগ্রেসের) নেতৃত্বও গান্ধীজীর হাতেই রয়েছে। এটাই খুব স্বাভাবিক যে কংগ্রেস আজ যদি কোনো সংগ্রাম শুরু করে তবে তা গান্ধীজী-প্রবর্তিত কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি

CENTRAL LIBRARY

রেখেই করবে। আমরা সেই কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে পারি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।" আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখ অন্যান্যদেরও একই রকম ধারণা ছিল।

বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে খানিকটা অসহায়তা বোধ থেকেই দলের অনেকগুলি মৌল ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। এঁরা মনে করতেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ট্রেড ইউনিঅন কংগ্রেস এবং কিষাণ সভার ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর ভূমিকা।

সি.এস.পি. প্রথমে তাত্ত্বিকভাবে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলেও পরে ক্রমেই বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছিল। এল. পি. সিন্‌হার ভাষায় : "সমাজতন্ত্রীরা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে আটক হয়ে পড়েছিলেন যেখানে তাঁদের হৃদয় ছিল গান্ধীর সঙ্গে আর মস্তিষ্ক ছিল মার্কসের সঙ্গে, এবং যদিও গান্ধীবাদ ক্রমেই জিতে যাচ্ছিল তবুও মার্কসের ভূত কিছুতেই যেতে চাইছিল না।" এই দলের নেতারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মতই সোভিয়েত ইউনিঅনকে মার্কসবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবে মানতেন। সোভিয়েত ইউনিঅনের পররাষ্ট্র নীতির অসামঞ্জস্য দেখে তাঁরা ক্রমেই মার্কসবাদের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ছিলেন।

এই পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি সি. এস. পি.কে একটি 'ভ্রাতৃপ্রতিম মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী দল' হিসেবে উল্লেখ করত এবং দুটি দলের একীকরণের জন্যে চাপ সৃষ্টি করে ও প্রচার চালায়। কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা এই প্রস্তাবে রাজী ছিলেন না। ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী দল গঠনের বদলে তাঁরা ক্রমেই পশ্চিম ইওরোপের ধাঁচে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল গঠনে উৎসাহী হচ্ছিলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ দেখা দেয় এবং রামগড় কংগ্রেসের সময়ে ১৯৪০ সালে সি.এস.পি থেকে দলের মধ্যে উপদল গঠনের অভিযোগে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। কিন্তু সি.এস.পি-র অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি প্রাদেশিক শাখাগুলির উপরে কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় তাঁরা দল থেকে যাবার সময়ে পুরো প্রাদেশিক শাখাগুলিই সি. এস. পি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এর ফলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে সাময়িকভাবে এই দল কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের প্রথম পর্বে যুদ্ধবিরোধিতার জন্যে এই দলের অসংখ্য কর্মী ও বহু বিখ্যাত নেতা যেমন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ অন্যান্য

CENTRAL LIBRARY

বামপন্থী সংগঠনের কর্মীদের মতই জেলে আটক ছিলেন। যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সি. এস. পি. ৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

রায়পন্থীদের ভূমিকা: ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতের সমস্ত বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলিই যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামী গোষ্ঠী যাঁরা সেই সময়ে 'লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' বলে পরিচিত ছিলেন। এঁরা প্রথম থেকেই যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলতে থাকেন। যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত এক দীর্ঘ ইস্তাহারে বলা হয় যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধও নয় আবার ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধও নয়। প্রথমত, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী নয় এই কারণে যে যুদ্ধে যোগদানকারী সমস্ত দেশই সাম্রাজ্যবাদী নয়। রায়ের মতে নাৎসী জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী নয় এই কারণে যে সে লগ্নী পুঁজি বিদেশে রপ্তানি করে না। অপরদিকে লগ্নী পুঁজি রপ্তানিকারী তথা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শীর্ষস্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে-দেশ জার্মানীর মতো একের পর এক বিদেশী রাষ্ট্র দখল করেনি। কিন্তু তবুও র‍্যাডিক্যালদের মতে জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী নয়। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধকে কোনভাবেই গণতন্ত্র বনাম ফ্যাসিবাদের লড়াইও বলা চলে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি, যথা ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি, যে তাদের যমজভাই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে এমন আশা করা যায় না। তাছাড়া, ব্রিটেন নিজেও যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিভূ নয়। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধ আপতিক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। কাজেই এখানে পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় যুদ্ধ কোনভাবেই সাম্রাজ্যবাদী অথবা ফ্যাসি-বিরোধী স্পষ্ট চেহারা নিতে পারেনি।

এই সমস্ত কারণে, রায়ের থিসিস অনুযায়ী, এই যুদ্ধ হল প্রতিবিপ্লবী শিবিরের আভ্যন্তরিক আত্মধ্বংসী যুদ্ধ। বিংশ শতাব্দী হল বিপ্লবের যুগ। এই সময়ে পৃথিবী দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এগুলি হল বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তি। যুদ্ধ প্রায় নিশ্চিতভাবেই সারা বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সুসংহত করবে এবং বহু দেশেই সফল বিপ্লব সংগঠিত হতে বাধ্য। ব্রিটেনের কাম্য হোক না হোক এই যুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটবে এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ আরও দুর্বল হবে। ব্রিটেনের গণতন্ত্রের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে, ভারতীয় জনগণকে 'আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধ'-এ তাদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করতে এবং স্বাধীনতা জয় করে নিতে আহ্বান জানানো হয়।

CENTRAL LIBRARY

এইভাবে রায়পন্থীদের যুদ্ধ-সংক্রান্ত ইস্তাহারে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয় তার মধ্যে যথেষ্ট জড়তা এবং অস্পষ্টতা থাকলেও তার মাধ্যমে একাধারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, ফরওআর্ড ব্লক, সি. এস. পি এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ-সংক্রান্ত বক্তব্য থেকে নিজেদের মতামতের ব্যবধান বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হল। কার্যগত-ভাবে অবশ্য এই থিসিসের একটাই অর্থ দাঁড়াল, সেটা হল যুদ্ধপ্রস্তুতিতে সাহায্য করা। একমাত্র অল্প কিছুদিনের জন্যে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল যখন এই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যুদ্ধকে 'আওয়াজসর্বস্ব' হিসেবে চিহ্নিত করে নিরপেক্ষতার নীতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার নীতি কোনভাবেই যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার নীতি ছিল না।

মানবেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসকে এই বলে সমালোচনা করেছিলেন যে দূর ভবিষ্যতের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়ে কংগ্রেসের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধে সহযোগিতার ভিত্তি খুঁজে বার করা। আলাপ-আলোচনার সুবিধাজনক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস বাস্তববাদী পথ না নেওয়ায় তিনি কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করেন। যুদ্ধের পরেও যদি ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয় তাতেই বা ক্ষতি কি? এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। তাঁর আরও একটি বক্তব্য ছিল যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা উচিত হয়নি, কারণ তাঁরা ক্ষমতায় থাকলে তার মাধ্যমে যুদ্ধের সময়ে নাগরিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে মজবুত করা যেত। মানবেন্দ্র-নাথের বক্তব্য ছিল যে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ক্রমেই ফ্যাসিবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ফ্যাসিবাদের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। প্রথমে কিছুদিনের জন্যে রায় তাঁর অনুগামীদের কংগ্রেসের মধ্যে মিশে থাকার পরামর্শ দিলেও ১৯৪০ সালের শেষ দিকে তিনি নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের নাম হয় 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'।

রায়পন্থীরা শুধু যে কার্যক্ষেত্রে যুদ্ধের শুরু থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস করেন তাই নয়, ইতঃপূর্বে তাঁরা কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গেও আপস করেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বামপন্থী সংহতি কমিটির পক্ষ থেকে ১৯৩৯ সালের জুন মাসে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে

বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার প্রতিবাদ দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হয় ৯ জুলাই তারিখে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সভাপতি এই মর্মে সার্কুলার জারি করেন যে যাঁরা এই প্রতিবাদ দিবসে অংশ নেবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংহতি কমিটির অন্যতম শরিক রায়পন্থীরা শেষ মুহূর্তে ঘোষণা করেন যে তাঁরা এই দিবস পালনে সহযোগিতা করবেন না, এবং তাঁরা কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।[২২]

CENTRAL LIBRARY

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ও ভারতের রাজনীতিক দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী

১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হয়। প্রথমত, এর ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রপক্ষে সোভিয়েত ইউনিঅন যোগ দেওয়াতে যুদ্ধে যোগদানকারী দেশের সংখ্যার এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে কিছু পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে ভারত এবং অন্যান্য দেশের রাজনীতিক দলগুলি যুদ্ধ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছিল তার পুনর্বিবেচনা শুরু করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সোভিয়েত ইউনিঅন সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করলেও যুদ্ধের মূল্যায়ন করতে যথেষ্ট ইতস্তত করেছিল। এর কারণ, আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃতি এবং করণীয় বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ছিল।

অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিঅন এই যুদ্ধে যোগ দেবার পরেও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বক্তব্যের কোনো পরিবর্তন করেনি। এই দলের মতে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে গেছে—সোভিয়েত ইউনিঅন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্যে যুদ্ধের চরিত্রের কোনো বদল ঘটেনি, অর্থাৎ এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ হয়ে ওঠেনি। দলের নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেবের মতে কোন যুদ্ধ তখনই জনযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে যখন কোনো পরাধীন দেশের জনগণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে, অথবা যখন কোনো দেশের জনগণ দেশের সরকার এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, অথবা এমন কোনো যুদ্ধ যা একই সঙ্গে পুঁজিবাদ এবং ফ্যাসিবাদের ধ্বংসের জন্যে চালানো হয়। এর কোনটাই, তাঁর মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চালিকাশক্তি বা উদ্দেশ্য নয়। ১৯৪১ সালের ৬ ডিসেম্বর সি. এস. পি-র সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন যে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই থেকে যেতে বাধ্য। কাজেই এই দল যুদ্ধবিরোধী প্রচার এবং যুদ্ধের কাজে বাধাদানের কর্মসূচী অব্যাহত রাখে এবং একই সঙ্গে স্বাধীনতার দাবিতে গণ-সংগ্রাম শুরু করার জন্যে কংগ্রেসের কাছে দাবি জানায়। কমিউনিস্ট পার্টির নতুন-নেওয়া জনযুদ্ধের নীতিকেও তারা কঠোর সমালোচনা করে।

CENTRAL LIBRARY

যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের পরেও মাস ছয়েক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ সম্পর্কে তার পুরনো মূল্যায়ন বজায় রাখে। আমরা আগেই বলেছি যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরে ব্রিটিশ পার্টির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হ্যারি পলিট নতুন বক্তব্য প্রচার করেন এবং এতে বলা হয় যে এখন থেকে ব্রিটেনের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু এই দলের অপর নেতা রজনী পাম দত্ত (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপরে যাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল) একটি বিবৃতিতে জানান যে যুদ্ধের প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে, এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মস্কো থেকে অন্য রকম কোনো নির্দেশ না পাওয়ায় পুরনো বক্তব্যই বলতে থাকে। সেই সঙ্গে এই দল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরো তীব্র করে তোলার আবেদন জানায়। কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যতদিন না ভারতে গণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিনই এই পথ অনুসরণ করা হবে। কেবল স্বাধীন জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারলেই ভারতের জনগণ সোভিয়েত ইউনিঅনকে বেশী সাহায্য করতে পারবে—দলের পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়। [২৩]

এর পরে অল্পদিনের জন্যে দলের পক্ষ থেকে 'দুই যুদ্ধ'-এর তত্ত্ব চালানো হয়। এর অর্থ ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে যে যুদ্ধ চলছে তা হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর পূর্ব রণাঙ্গনের অর্থাৎ জার্মানী এবং সোভিয়েতের মধ্যেকার যুদ্ধ হল জনযুদ্ধ। কিন্তু এই তত্ত্ব বেশীদিন চলেনি। দলের পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যে-তত্ত্ব তখনও চালানো হচ্ছিল তার সঙ্গে দলের যে নেতারা দেওলী বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছিল। এইসব নেতারা বন্দী নিবাসের মধ্যে জনযুদ্ধের তত্ত্বের রূপদান করেছিলেন এবং একই সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রস্তুতিতে শর্তহীন সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাতে এই যুদ্ধ যে জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে এ কথা বলা হয়। এর পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি খোলাখুলিই নতুন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে এবং একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা এবং স্বাধীনতার দাবি চালিয়ে যাওয়াকেও তাদের বক্তব্যের অংশ হিসেবে রাখে।

১৯৪২ সালের ফেব্রুআরি মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা "ফরওয়ার্ড টু ফ্রীডম"-এ

CENTRAL LIBRARY

দলের সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী নতুন এবং পরিবর্তিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে চারটি জাতীয় কর্মসূচী তুলে ধরেন। এগুলি হল :

১। ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার জন্যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য দলকে নিয়ে একটি জাতীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা।

২। এই রকম জাতীয় ফ্রন্টের ভিত্তিতে বোঝাপড়ায় আসবার জন্যে এবং সমস্ত স্তরের ঐকাবদ্ধ সমর্থন সমেত একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করা।

৩। জাতীয় সরকার গঠন ইত্যাদির জন্যে চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি পুরোপুরিভাবে যুদ্ধের কাজে সহায়তা করা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে জনগণকে যুদ্ধের কাজে সহযোগিতার জন্য সংঘবদ্ধ করা।

৪। ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে বলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতাকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করা।[২]

এর পরে ১৯৪২ সালের ২৩ এপ্রিল কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দলের নীতি এবং কাজের পরিকল্পনা-সমন্বিত একটি গোপন স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এই দলিলে সরকারের যুদ্ধপ্রস্তুতির সহায়তা করার জন্যে দলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার, সৈন্যদলের জন্যে লোক সংগ্রহ করা, যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্যে বিশেষ গেরিলা বাহিনী এবং আত্মহত্যা স্কোয়াড গঠন করা, যাতে কলকরখানায় ধর্মঘটে যুদ্ধের জন্যে উৎপাদন ব্যাহত না হয় তার জন্যে মজুরদের মধ্যে ধর্মঘটবিরোধী এবং উৎপাদনপন্থী প্রচার চালানো ইত্যাদি কাজ করবার প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে সমস্ত ধরনের কমিউনিস্ট বন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তি এবং দলের মুখপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার দাবি জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন কাগজপত্র বার করবার অনুমতিও চাওয়া হয়। সমস্ত কমিউনিস্ট বন্দীকে ছেড়ে দেবার দাবির পরিবর্তে তা ক্রমে বাছাই-করা কিছু কমিউনিস্ট নেতার মুক্তির দাবিতে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রয়োজনে সরকারকে তাঁরা কমিউনিস্ট নেতাদের ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অগস্ট আন্দোলনের সময়েও কমিউনিস্ট পার্টি একই নীতি এবং কর্মসূচী বজায় রাখে। একই কারণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আজাদ হিন্দ আন্দোলনের বিরুদ্ধে

CENTRAL LIBRARY

কমিউনিস্ট পার্টি সরকার-বিবৃত কুৎসা এবং নিন্দাই প্রচার করেছিল। ভারতীয় জনগণের মুক্তিকামনা ও সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলায় ১৯৪২-৪৫ কালপর্বে কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা হারায়।[৩]

কমিউনিস্টদের বক্তব্য : বর্তমানে সি.পি.আই এবং সি. পি. আই (এম) এই দুটি দলের পক্ষ থেকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৪-৫] বর্তমান বিষয়ে তাঁদের নিজেদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা হল :

১। কমিউনিস্ট পার্টি পুরো ব্যাপারটা দেখেছিল শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে। কংগ্রেস বুর্জোআ শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত। অপরদিকে সি.পি.আই. ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতিনিধি। (M. Basav-punnaiah, পৃ. ১৮)

২। সি.পি.আই.-এর যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন হবার কারণ সোভিয়েত ইউনিঅন বা ব্রিটিশ কমিউনিস্ট দলের নির্দেশ নয় বরং দলের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিট ব্যুরো স্তরে আলোচনা, বিতর্ক এবং জেল থেকে প্রেরিত দলের নেতাদের যুদ্ধের পুনর্মূল্যায়নমূলক দলিল প্রভৃতি। (M. Basava-punnaiah, পৃপৃ. ২১-২ ; Chattopadhyay পৃপৃ. ১৩-৪ ; Dilip Basu, পৃপৃ. ৯-১০)

৩। নতুন মূল্যায়ন অনুযায়ী যুদ্ধের দুটি পর্ব : প্রথমটি ১৮ মাস স্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্ব এবং দ্বিতীয়টি সোভিয়েত ইউনিঅন আক্রান্ত হবার ফলে সাড়ে চার বছর স্থায়ী জনযুদ্ধের পর্ব। শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই মূল্যায়ন করা হয়। রাশিআ আক্রান্ত হওয়াটাই একমাত্র কারণ ছিল না। ক্রমঅগ্রসরমান ফ্যাসিবাদের জয় সমস্ত মানবজাতির পক্ষেই সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ হয়ে উঠেছিল, তাকে রোখা সেই সময়ে সবচেয়ে জরুরী ছিল। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ২৩, ২৬, ২৮ ; Dilip Basu পৃপৃ. ১১-৩ ; Hiren Mukerjee, পৃপৃ. ১০-১)

৪। ১৯৪০ সালেই চূড়ান্ত সংগ্রাম কংগ্রেসের শুরু করা উচিত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় এটা না করে জনযুদ্ধের পর্বে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-র শ্লোগান তোলার থেকে বোঝা যায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন (১৯৪১-৪২) কিছুই বোঝেননি। ১৯৩৯-৪২ এই সময়ে তাঁদের

ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত সুবিধাবাদী এবং সংস্কারবাদী। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৩০ ৩৬, ৩৮, ৬৫)

৫। ঐতিহাসিক দিক্ থেকে ৪২-এ কমিউনিস্টদের ভূমিকা সঠিক ছিল। কারণ তখন সোভিয়েত ইউনিঅনের বিজয়কে তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিঅনের বিজয়ের ফলেই ফ্যাসিস্ত অস্তিত্ব নির্মূল হয় এবং যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য রকমে দুর্বল হয়ে যায়, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়। (তদেব, পৃ. ৩৭)

৬। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাতে গোপন বা লজ্জাজনক কিছুই ছিল না, বরং তাতে কয়েকটি ন্যায্য দাবি ছিল। (M. Basavapunnaiah, পৃ. ৪০, Goutam Chattopadhyay, পৃ. ১৮, Dilip Basu, পৃ. ২৬)

৭। সুভাষচন্দ্র বসু যে রাজনীতিক লাইন গ্রহণ করেছিলেন (জার্মানী ও জাপানের সহায়তা নেওয়া) তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবশ্যই ভুল হবে। কিন্তু তাঁর রাজনীতিক কৌশলগত (tactical) লাইন যে ফ্যাসিবিরোধী উদ্দেশ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর ছিল তা তুলে ধরে কমিউনিস্টরা ঠিক কাজই করেছিল। গান্ধীও একই কাজ করেছিলেন। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৪৩-৪)

৮। জাতীয় সরকারের জন্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা করে কমিউনিস্ট পার্টি ঠিকই করেছিল। তবে মুসলমানদের জড়ো করার ব্যাপারে দলের সাফল্যকে জাতীয় চেতনা (nationality consciousness)-র বিকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে দল ভুল করেছিল। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৫১-৬ ; Hiren Mukerjee, পৃ. ১৪)

৯। কমিউনিস্টদের কাজে আকৃষ্ট হয়ে ৪২ আন্দোলনের কিছু নেতা দলে যোগ দেন। বিভিন্ন সরকারী দলিলপত্রে দেখা যায় যে সরকার কমিউনিস্টদের বিশ্বাস করত না কারণ কমিউনিস্টরা সরকারের 'এজেন্ট' ছিলেন না। কমিউনিস্ট কর্মীরা ৪২-এর আন্দোলনে কেউ কেউ শহীদ হন এবং তাঁরা সরকারবিরোধী ভূমিকা নেন। (Goutam Chattopadhyay, পৃপৃ. ১৫-২০ ; Hiren Mukerjee., পৃ. ১১-৩)

১০। সি.পি.আই. মূলত নির্ভুল থাকলেও তার কয়েকটি ক্ষেত্রে 'মারাত্মক' কৌশলগত ভুল হয়েছিল। বিশ্ব ফ্যাসিস্টজোটের বিরুদ্ধে লড়াই করতে

CENTRAL LIBRARY

গিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার আক্রমণের ধার রীতিমত ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টায় দলের সমর্থন ব্রিটিশ শাসকদের যুদ্ধনীতি এবং প্রচেষ্টার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে দেশপ্রেমিক জনগণের বিপুল অংশ সঠিকভাবেই কমিউনিস্টদের ভুল বুঝেছিলেন।

১৯৪৮ সালে দল কর্তৃক প্রকাশিত একটি দলিলে এই ভুলগুলিকে স্বীকার করা হয়। (M. Basavapunnaiah, পৃপৃ. ৩৮-৯)

অন্যান্য বামপন্থীদলের বিশ্লেষণ

আর. এস. পি., আর. সি. পি. আই প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলি সি.পি.আই-এর 'জনযুদ্ধ'-এর তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে। সোভিয়েত ইউনিঅনের উপর নাৎসী আক্রমণের ফলে যুদ্ধের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে এ যুক্তি তারা গ্রহণ করে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে সোভিয়েত ভারত গঠনের মারফতই একমাত্র সোভিয়েত ইউনিঅনকে সাহায্য করা সম্ভবপর—এই ছিল তাদের অভিমত।[৬]

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চম অধ্যায়

অগস্ট আন্দোলন (১৯৪২-১৯৪৪)

সূত্রপাত—১৯৪২ সালের প্রায় প্রথম থেকেই গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি দৃঢ়ভাবে আপসরফা-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং অবিলম্বে ইংরেজের ভারত ছাড়তে হবে এই দাবি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও দৃঢ় হচ্ছিল। ক্রিপস প্রস্তাব আলোচনার সময়ে তাঁর ভূমিকা আমরা দেখেছি। কিন্তু, পাশাপাশি কিছু কংগ্রেস নেতা, যাঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধে সহযোগিতা এবং সরকারের সঙ্গে আপসের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাও আমরা দেখেছি। এর অব্যবহিত পরে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ওআর্কিং কমিটি এবং সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় দুটি পথের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব বাধে। ওআর্কিং কমিটিতে গান্ধীজীর প্রস্তাব নাকচ হয় এবং নেহরুর খসড়া গৃহীত হয়। কিন্তু এ.আই.সি.সি.তে দুটি খসড়া মিলিয়ে আপসের মাধ্যমে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে নেহরুর 'শর্তহীন সহযোগিতার নীতি' পরিত্যক্ত হয়। অপরদিকে 'স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক কর্তব্য সম্ভবত হবে জাপানের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসা'—গান্ধীজীর এই বক্তব্যও বাতিল করা হয়।[১]

গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় মে মাসে যত লেখা লেখেন সবগুলিতেই ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ এবং ইংরেজের ভারত ছাড়া সম্পর্কে তাঁর আপসহীন মনোভাব অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে ফুটে ওঠে।[২] জুন মাসে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাঁচদিন ওআর্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়ে মন্তব্য করেন যে 'যুদ্ধের শুরুতে যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর যে নীতি এবং ধারণা ছিল তার থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন।'[৩] যুদ্ধ সম্পর্কে নিজের ধারণা এবং পরিকল্পিত কর্মসূচী গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ করেন যে গান্ধীজী এ ব্যাপারে দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে যদি জাপানীরা ভারতে প্রবেশ করে তবে সেটা তারা করবে ভারত-বাসীর শত্রু হিসেবে নয়, ইংরেজের শত্রু হিসেবে। সর্দার প্যাটেলকেও তিনি গান্ধীজীর এই বক্তব্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত দেখতে পান।

CENTRAL LIBRARY

১৯৪২ সালের ৫ জুলাই মৌলানা আজাদ ওআর্কিং কমিটির বৈঠকের জন্যে ওআর্ধায় পৌছে গান্ধীজীর কাছ থেকে প্রথম 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা শোনেন। প্রথম থেকে মৌলানা আজাদ এই ধরনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল এ রকম আন্দোলন শুরু হলে যুদ্ধকালীন পরিবেশে ব্রিটিশ সরকার তা একেবারেই বরদাস্ত করবে না এবং তা চূড়ান্তভাবে দমন করবে। কিন্তু গান্ধীজীর ধারণা ছিল তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাবার সুযোগ পাবেন। অপরদিকে, আন্দোলনের কর্মসূচী কি হবে গান্ধীজীর সে সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে একটা ব্যাপারে তিনি প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলেন যে এবারে আর অন্যান্য বারের মতো জনগণ স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করবে না। আজাদ এবং কংগ্রেসের মধ্যপন্থী অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর অবিচল মনোভাব দেখে এবং জনগণের উপরে তাঁর অপরিসীম প্রভাবের কথা স্মরণ করে অবশেষে প্রস্তাবিত আন্দোলনের বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন। আজাদ প্রথম থেকেই যে ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন সেটা হল গান্ধীজী যতক্ষণ মুক্ত থাকবেন ততক্ষণ আন্দোলন অহিংস থাকলেও তাঁকে কারারুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন সহিংস পথ নেবে। একমাত্র জওহরলাল নেহরুই আজাদকে সমর্থন করেছিলেন। ওআর্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেননি।

গান্ধীজীর ধারণা ছিল আজাদের আশঙ্কার ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ, সীমান্তে যুদ্ধের বিপদ থাকায় আন্দোলন শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের চাপেই কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করবে। যদিও মৌলানা আজাদ আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠবে এই ভয়ে খুবই ভীত ছিলেন তবুও তাঁর এ কথাও মনে হয়েছিল যে এই ধরনের একটা সহিংস আন্দোলন ও ধ্বংসাত্মক কাজ নেতৃত্ব-বিহীনভাবে ঘটে চললে (অর্থাৎ, নেতারা বন্দী থাকলে) একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করতে পারে। ওআর্কিং কমিটির এই বৈঠকে গান্ধীজীর সঙ্গে মৌলানা আজাদ এবং জওহরলাল নেহরুর মতবিরোধ এমন চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছয় যে গান্ধীজী আজাদকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তাঁরা যদি চান যে আসন্ন আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ব করবেন তবে আজাদকে অবশ্যই কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে হবে এবং আজাদ আর নেহরু দুজনকেই ওআর্কিং কমিটি থেকেও পদত্যাগ করতে হবে। গান্ধীজীর এই চরমপত্রের ফলে একটা চূড়ান্ত অচলাবস্থার

সৃষ্টি হয়। অবশেষে সর্দার প্যাটেলের মধ্যস্থতায় এই সংকটের নিরসন হয়। ১৪ জুলাই পর্যন্ত আলোচনা চলে এবং ঐ দিন ওআর্কিং কমিটি জাতীয় দাবি-সংবলিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

ঐ প্রস্তাবে অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান দাবি করা হয়। বলা হয়, নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং অন্য সমস্ত রকমের সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্যে বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে ভারতের স্বাধীনতা অবিলম্বে প্রয়োজন। প্রস্তাবে এ কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয় যে ভারত জাপানকে অথবা অন্য যে-কোন বিদেশী আগ্রাসী শক্তিকে রুখতে চায়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিক্ততা স্বাধীনতার পরে অবসান হবে এবং ভারত মিত্রশক্তিতে যোগ দেবে—এ কথাও বলা হল। দুটি দেশের মধ্যে সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতিও অগ্রিম দিয়ে রাখা হয়। সবশেষে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে কোনরকম বাধাদান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয় এবং স্বাধীন ভারতেও মিত্রপক্ষের সৈন্য রাখার ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই।[৪]

উপরের এই প্রস্তাবের বয়ান পড়ে দেখলে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে ওআর্কিং কমিটির এই প্রস্তাবও আপসের ফল এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষায় "স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রিটেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার বাঞ্ছনীয়তা এবং তাকে কাজে পরিণত করবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অন্ধ ধারণা তখনও কোনো কোনো কংগ্রেস নেতা পোষণ করতেন। আরো দেখা যায় যে গান্ধী ২৭ মে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির কাছে তাঁর খসড়া প্রস্তাবে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, কংগ্রেস তা থেকে অনেকটা সরে গিয়েছিল।...বস্তুত কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁরা এতদূর আশা করেছিলেন যে ভারতের জাতীয় দাবির অনুকূলে ভারতীয় প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশেষত আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতে পারে।"[৫]

১৪ জুলাই প্রস্তাব গ্রহণের পরে গান্ধীজীর নির্দেশে তাঁর গোঁড়া সমর্থক এবং সবরমতী আশ্রমবাসিনী মিস্ স্লেড (ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তিনি গান্ধীজী দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন; ইনি মীরা বেন নামে বেশী পরিচিত ছিলেন) দিল্লীতে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর দায়িত্ব ছিল বড়লাটকে ওআর্কিং কমিটির প্রস্তাব এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিব তাঁকে জানিয়ে দেন যে গান্ধীজী খোলাখুলি বিদ্রোহের কথা বলার পরে বড়লাটের সঙ্গে দেখা

CENTRAL LIBRARY

হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, এ কথাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে বিদ্রোহ অহিংসই হোক অথবা সহিংসই হোক যুদ্ধের পরিবেশে কোনভাবেই তা বরদাস্ত করা হবে না। মীরা বেনকে একান্ত সচিবের সঙ্গে কথা বলেই ফিরে আসতে হয়। এর পরেই গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই এক বিবৃতিতে বলেন, এ কথা ঠিক নয় যে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহ শুরু করার কথা বলেছেন। এটা একটা ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া কিছুই নয়। এই বিবৃতিতে কংগ্রেস সভাপতি কিছুটা বিস্মিত বোধ করেন। কারণ, আজাদের মতে গান্ধীজী এর আগে অহিংস বিদ্রোহের কথা বলেছিলেন।[৬]

১৪ জুলাই থেকে ৫ অগস্ট কংগ্রেস সভাপতি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে আন্দোলনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকিফহাল করেন। আজাদের গোপন নির্দেশ ছিল এইরকম যে যতক্ষণ গান্ধীজী সমেত অন্য নেতারা জেলের বাইরে থাকবেন ততক্ষণ আন্দোলন কঠোরভাবে অহিংস রাখতে হবে, কিন্তু তাঁদের আটক করা হলে সরকারী হিংসাকে মোকাবিলা করার জন্যে জনগণ যে-কোন সম্ভাব্য পন্থা—সহিংস বা অহিংস—গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে উদ্ভূত অবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে ব্রিটিশ সরকারের উপরে। আজাদের এই বক্তব্যের গভীর তাৎপর্য পরে আমরা দেখতে পাব। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে তাঁর ধারণা হয় যে বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই এবং দিল্লীতে আন্দোলন যথেষ্ট ব্যাপক আকার নেবে, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কে তাঁর নিজের কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আসামে প্রচুর পরিমাণে সামরিক উপস্থিতি থাকায় বাংলা ও বিহারের মাধ্যমে পরোক্ষে সেখানকার সঙ্গে আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপনের কর্মসূচী নেওয়া হয়।

বড়লাট মীরা বেনকে প্রত্যাখ্যান করার পরেও গান্ধীজীর এ রকম ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ সরকার অতি দ্রুত মারাত্মক কোনো দমনমূলক ব্যবস্থা নেবে না। গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে এ.আই.সি.সি. বৈঠকের পরে তিনি যথেষ্ট সময় পাবেন। সেমতাবস্থায় পরিকল্পনামাফিক আন্দোলনের সূচনা করা যাবে। তবে কংগ্রেসের সভাপতি এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মত আশাবাদী ছিলেন না। ২৮ জুলাই আজাদ এক চিঠিতে গান্ধীজীকে এই কথা জানিয়ে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেন যে বোম্বাই অধিবেশনের সঙ্গেসঙ্গেই দমন ব্যবস্থা নেমে আসবার

CENTRAL LIBRARY

খুবই সম্ভাবনা আছে। গান্ধীজী উত্তরে তাঁকে জানান এত তাড়াহুড়ো করে কিছু ভেবে নেওয়াটা ঠিক হবে না।[৭]

৭ অগস্ট এ.আই.সি.সি.-র অধিবেশনের আগে ৫ অগস্ট ওআর্কিং কমিটি চূড়ান্ত পর্যালোচনার জন্যে বৈঠকে মিলিত হয় এবং একটি খসড়া প্রস্তাব এ. আই. সি. সি. অধিবেশনে পেশ করার জন্যে অনুমোদন করে। ৭ অগস্ট সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসে এবং বিস্তৃত আলোচনার পরে ৮ অগস্ট রাত্রে কেবল অল্পসংখ্যক কমিউনিস্ট ছাড়া আর সবাই বিপুল সংখ্যাধিক্যে ঐতিহাসিক **ভারত ছাড়ো** প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই গান্ধীজী নব্বই মিনিটব্যাপী এক চাঞ্চল্যকর ভাষণে ঘোষণা করেন: "এখন থেকে আপনারা প্রত্যেকেই নিজেকে একজন স্বাধীন নারী অথবা পুরুষ বলে জানবেন এবং একজন স্বাধীন মানুষের মতই আচরণ করবেন। ···ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে কম কিছু নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব না···আমরা করব অথবা মরব। আমরা হয় ভারতকে স্বাধীন করব অথবা সেই চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব।"[৮]

৮ অগস্ট গভীর রাত্রে এ.আই.সি.সি.-র সভাভঙ্গ হয় এবং ৯ অগস্ট ভোরবেলার মধ্যেই গান্ধীজী, নেহরু, আজাদ, সরোজিনী নাইডু, আসফ আলী, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারাই শুধু যে পুলিসের হাতে বন্দী হন তা নয়, প্রত্যেক প্রদেশের, এমন কি জেলাস্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা যাঁরা অবিলম্বে আত্মগোপন করতে পারেননি, তাঁরা সবাই অনতিবিলম্বে ধরা পড়েন। তবে সব কংগ্রেস নেতাই যে তৎপরতার সঙ্গে আত্মগোপন করেন বা গোপন প্রতিরোধের কর্মসূচী ও সংগঠন তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন তা ভাববার কোনো কারণ নেই। একথা মনে হতে পারে যে কংগ্রেস নেতারা গণ-আন্দোলন পরিচালনা করতে চাইছিলেন না, অপরপক্ষে তাঁরা যেহেতু জানতেন যে এই আন্দোলনকে কখনই অহিংসার জালে আটকে রাখা যাবে না সেইজন্যে তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভবপর গ্রেপ্তার হয়ে আন্দোলনের সরাসরি দায় এড়াতে চাইছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভুলাভাই দেশাই বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও এবং নিশ্চিত গ্রেপ্তার হবেন জেনেও আজাদ ভুলাভাই দেশাইয়ের বাড়ি ছাড়তে চাননি, বরং গ্রেপ্তার হবার জন্যেই তৈরী হয়েছিলেন। অন্য কংগ্রেস নেতাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। জনগণের এই আন্দোলনে তাঁরা নেতৃত্ব দেননি, কিন্তু এর ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দরকষাকষিতে তাঁদের আগ্রহ কম ছিল বলে মনে হয় না।[৯] বাধ্য

CENTRAL LIBRARY

হয়ে আন্দোলনে সায় দিলেও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী মূলত যে আপসমুখীই ছিল সেটা শেষ পর্যন্ত তাঁদের আপসের চেষ্টা চালানোর থেকেই বোঝা যায়।[১০]

অগস্ট আন্দোলন ও বিভিন্ন দলের ভূমিকা

৯ অগস্ট ভোরবেলা কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হরতাল ও ধর্মঘট থেকে শুরু করে নাশকতামূলক কাজ—সব পদ্ধতিতেই নিরস্ত্র জনগণের সঙ্গে সরকারের পুরো মাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হবার সঙ্গেসঙ্গেই সারা দেশে সমস্ত শাখা-প্রশাখা সমেত কংগ্রেস সংগঠন গোপনে কাজ চালাতে থাকে।

'৪২-এর অগস্ট আন্দোলনের তীব্রতা এবং ব্যাপ্তির ফলে দেশের কোনো রাজনীতিক দলের পক্ষেই এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভবপর ছিল না। যুদ্ধে সহযোগিতা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল সংগ্রাম শুরু হয়ে যাওয়ায় তা চূড়ান্ত বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যাঁরা সবসময়ে আপসের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা শেষপর্যন্ত সংগ্রামের পক্ষে রায় দেওয়ার ফলে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে কোনো গোষ্ঠী না থাকায় দেশের রাজনীতিক মহল সরাসরি দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। বৃহত্তর শিবিরে ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ বামপন্থী রাজনীতিক দল ও গোষ্ঠীগুলি—সি. এস. পি., ফরওআর্ড ব্লক, আর. এস. পি., আর. সি. পি. আই, বলশেভিক-লেনিনিস্ট পার্টি—এবং সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা। অপরদিকে ক্ষুদ্রতর শিবিরটি তৈরী হয়েছিল সরকারের যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে সাহায্যকারী এবং আন্দোলনে বাধাদানকারী দলগুলি নিয়ে। এরা হল—সি. পি. আই., র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (রায়পন্থী) এবং বলশেভিক পার্টি অব ইণ্ডিয়া। নীচে বিভিন্ন দলের ভূমিকা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। কমিউনিস্ট পার্টি (সি. পি. আই.)—যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে সংগ্রাম-বিরোধী এবং যুদ্ধে সহযোগিতার নীতি নিয়েছিল তার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বযুদ্ধকে এই সময়ে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-এর পরিবর্তে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং

CENTRAL LIBRARY

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। সি. পি. আই. ২২ জুলাই থেকে বৈধ বলে ঘোষিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই সময়ে যে সব রাজনীতিক দাবি তোলা হয় তার মধ্যে একটি ছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য—যদিও ঐক্য না হলে বিকল্প কর্মসূচী কি হবে সে সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চুপ ছিলেন। ১৯৪২ সালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারত ট্রেড ইউনিঅন কংগ্রেস (AITUC) এবং সারা ভারত কিষাণ সভা (AIKS)-র উপরে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে, যার ফলে এই গণ সংগঠন দুটিই অগস্ট আন্দোলনের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোথাও কোথাও কমিউনিস্ট কর্মীরা সংগঠনের নির্দেশ অমান্য করেও আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। এই ইস্তাহারে সরকারের কাছে দমনব্যবস্থা তুলে নেবার দাবি জানানো হয়। এই সঙ্গে গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদান, কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং জাতীয় সরকারের জন্যে আলোচনা শুরু করার দাবি জানানো হয়। পার্টির পক্ষ থেকে তিন-দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৪৩ সালের মে মাসে আহূত প্রথম বার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলনে তা অনুমোদিত হয়। এই তিন দফা হল : ১। সারা দেশে ঐক্যের জন্যে প্রচার সংগঠন করা, ২। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র এবং জঙ্গী কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ধৈর্যের সঙ্গে নিজেদের রাজনীতিক বক্তব্য ব্যাখ্যা করা, ৩। সারা দেশে হিন্দু এবং মুসলমান জনগণের মধ্যে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যের জন্যে প্রচার চালানো।[১১]

২। র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি—আমরা আগে দেখেছি যে মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই দলের পত্তন করেন। দলটি কোনোভাবেই কংগ্রেসের মধ্যে ছিল না। দলটি যুদ্ধকালীন পরিবেশে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে নিঃশর্ত সহযোগিতার কথা বলায় জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়ার ঘটনাও জনপ্রিয় না হবার অপর কারণ বলা যেতে পারে।[১২]

এঁরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলে আসেন এবং অগস্ট আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। এঁদের সংখ্যাগত শক্তি খুব কম ছিল।

CENTRAL LIBRARY

৩। বলশেভিক পার্টি—এই দলটি নিজেদের 'লেনিন এবং স্টালিনের দল' বলে অভিহিত করত। কমিউনিস্ট পার্টির মতই জার্মানী সোভিয়েত ইউনিঅন আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত এই দল যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই বলত এবং এই যুদ্ধের সুযোগে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার পক্ষে ছিল। যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মতই একইভাবে এই দলের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দেখা যায়। সুভাষচন্দ্র যতদিন ভারতে ছিলেন ততদিন এই দল তাঁকে এবং ফরোআর্ড ব্লককে সমর্থন করে। এমনকি, রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলনের সময়ে (মার্চ ১৯৪০) যখন কমিউনিস্ট পার্টি এবং সি.এস.পি. সুভাষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে তখনও তারা এই সম্মেলনে যোগ দেয়। অবশেষে দলের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্কের পরে এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং অগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়। বামপন্থীদের মতে কংগ্রেস বুর্জোআরা পুরো ফ্যাসিবাদী অপরদিকে কমিউনিস্টদের মতে তারা ফ্যাসিবিরোধী। কিন্তু বলশেভিক পার্টির মতে কংগ্রেস বুর্জোআরা ফ্যাসীবাদ-প্রবণ (pro-fascist)। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে বলশেভিক পার্টি দাবি করে যে কংগ্রেসের 'ভারত-ছাড়ো' প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। ১৯৪৩ সালের গোড়ায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দুটি মূল কর্মসূচী হাজির করে। এর একটি হল নাশকতামূলক আন্দোলনের বিরোধিতা করা এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ফ্রন্টকে শক্তিশালী করা। দ্বিতীয়টি হল ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মজবুত করা। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে দলের ভূমিকা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই দলের সর্বাধিক পরিচিত নেতা নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। ১৯৪২ সালের শেষ দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৩]

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলগুলির অধিকাংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেওয়া হল :

১। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. পি.) : 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে সি.এস.পি.-র অগ্রণী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাপক দমন পীড়নের মধ্যে গোপনে আন্দোলন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব এই দলের নেতারা নিয়েছিলেন। এই কাজে রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৮ অগস্ট

এ.আইসি.সি. অধিবেশনে এঁরা সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং যে-কোন মুহূর্তে সরকারী দমনমূলক ব্যবস্থা নেমে আসতে পারে আন্দাজ করে অত্যন্ত দ্রুত আত্মগোপন করেছিলেন। এঁরাই বোম্বাইয়ের ক্যাথিড্রাল স্ট্রীটের একটি বাড়িতে গোপনে নিষিদ্ধ এ.আই.সি.সি হিসেবে কাজ শুরু করেন। এছাড়া রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন এবং সুচেতা কৃপালনী মিলে কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থা (Central Directorate) নামে একটি সেল গঠন করেন। এখান থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের খবরাখবর বোম্বাই এ আই.সি.সি.-তে পাঠানো হত। এই কার্যালয়কে সি.এস.পি.-র গোপন কেন্দ্রীয় কার্যালয় বলেও চিহ্নিত করা চলে। গোপন আন্দোলনের কাজকর্মে দল খুব গুরুত্ব অর্জন করে।[১৪]

১৯৪২ সালের ১০ অগস্টের একটি প্রচারপত্রে সি.এস.পি. এই সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সারা দেশে গ্রাম-শহরে হরতালের ডাক দেয়।[১৫] দলের সাধারণ সম্পাদক জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৪২ সালের ৯ নভেম্বর হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল ভেঙ্গে অন্য পাঁচজন রাজনীতিক বন্দীর সঙ্গে পালিয়ে যান। সমস্ত সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর এই সময়কার খোলা চিঠি দলের কর্মী ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।[১৬] বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা পদ্ধতিতে আন্দোলন সংগঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, উৎপাদন ব্যাহত করে যুদ্ধের কাজে বাধা সৃষ্টি করা, থানা দখল করা ও অঞ্চল স্বাধীন করা ইত্যাদি বৈপ্লবিক কাজের শিক্ষার জন্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ একের পর এক গোপন পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং এই দলের পক্ষ থেকে গোপন শিক্ষা শিবির তৈরি করা হয়। বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ নেবার ফলে দলের বহু কর্মী ও সমর্থক হতাহত হন এবং নেতারা নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হন।

২। ফরওআর্ড ব্লক—সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরওআর্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই দল এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যুদ্ধের সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে চূড়ান্ত এবং আপসবিরোধী সংগ্রামের প্রচার অবিরত চালিয়ে যেতে থাকে।

৮ অগস্ট আই. সি. সি.-তে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হবার পরেই ফরওআর্ড ব্লক কর্মীরাও আত্মগোপন করেন এবং ১০ অগস্ট এই দলের পক্ষ থেকে "স্বাধীনতার যুদ্ধ" (War of Independence) শীর্ষক একটি প্রচারপত্র

CENTRAL LIBRARY

প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকাতে সি. এস. পি. প্রচারপত্রের মতই সারা দেশে হরতাল পালন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসের আহ্বান জানানো হয়।[১৭]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলেন। তিনি এই সময়ে জার্মানীতে মুক্তিবাহিনী তৈরির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি আন্দোলনকারীদের কাছে গোপন বার্তা এবং বেতার বক্তৃতার মারফত নানা নির্দেশ পাঠান। ফরওআর্ড ব্লকের কর্মীরা এ সবের দ্বারা পরিচালিত হতেন এবং আন্দোলনের কর্মসূচী সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪২ সালের ৩১ অগস্ট প্রচারিত নেতাজীর বেতার ভাষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সংগ্রামকে 'অহিংস গেরিলা লড়াই' নামে অভিহিত করে তিনি এর দুটি প্রধান উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেন। প্রথমটি হল, ভারতে যুদ্ধের জন্যে উৎপাদনকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয়ত, সারা দেশে ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া। এছাড়া তিনি এই লক্ষ্যের ভিত্তিতে ছয়-দফা কর্মসূচী দেন। এর মধ্যে সমস্ত রকম করদান বন্ধ করে দেওয়া থেকে শুরু করে কারখানা শ্রমিকদের 'ধীরে চলো' কর্মনীতি গ্রহণ, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং ছাত্র, নারী, সরকারী কর্মচারী, গৃহভৃত্য প্রভৃতি সবার জন্যে আলাদা ধরনের কাজের প্রস্তাব ছিল। এছাড়াও আরও বারো-দফা খুঁটিনাটি নির্দেশ ছিল গেরিলা লড়াইয়ের। 'অহিংস গেরিলা লড়াই' কথাটা রাজনীতিক কারণে ব্যবহার করলেও তিনি বস্তুত ঐ বক্তৃতায় পুরো দস্তুর গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনাই দিয়েছিলেন।[১৮]

৩। রেভোলিউশ্যনারী সোস্যালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি)—আগেকার বিপ্লবী দল 'অনুশীলন সমিতি'র মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত অথচ স্তালিন-নেতৃত্বের সমালোচক নেতা ও কর্মীরা ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড় আপসবিরোধী সম্মেলনের ময়দানে এই নতুন দলের জন্মের কথা ঘোষণা করেন।[১৯] এঁদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট ছিল এবং রামগড় আপসবিরোধী সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টি এবং সি.এস.পি. যোগ না দিলেও এঁরা যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধকে এই দল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ ভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং যুদ্ধবিরোধিতার নীতি নিয়েছিল। এই দল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেয়। দলের অধিকাংশ সদস্যই কারারুদ্ধ হন। দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চ্যাটার্জী দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে[২০] উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে আন্দোলনের

CENTRAL LIBRARY

নেতৃত্ব দেন। এই দলের যুক্তপ্রদেশের তরুণ কর্মী রাজনারায়ণ মিশ্রকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

৪। রেভোলিউশ্যনারী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিআ (আর.সি.পি.আই) : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে পরিচালিত আর.সি.পি.আই. যদিও কখনও কংগ্রেসের মধ্যে ছিল না, তা সত্ত্বেও এই দল এই আন্দোলনের গণ-চরিত্র অনুধাবন করে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের সঙ্গে আর.সি.পি.আই.-এর কর্মসূচীগত সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বুর্জোআ কংগ্রেস বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে অগস্ট আন্দোলনকে সাবোতাজ করেছে।[২১] আর.সি.পি.আই.-এর মতে এই পার্টি "জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, জাগ্রত গণ বিস্ফোরণের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কখনোই বুর্জোআ কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ায়নি।"[২২]

৫। বলশেভিক-লেনিনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিআ (বি.এল.পি.আই) : ভারতবর্ষের ট্রটস্কিপন্থীরা ১৯৪১ সালে বি.এল.পি.আই. গঠন করেন। চতুর্থ আন্তর্জাতিকপন্থী এই দলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে। এবং বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লবী প্রয়োজনে ব্যবহারের আহ্বান জানায়।[২৩] কংগ্রেসের বুর্জোআ নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও[২৪] এই দল অগস্ট আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

উপরে কেবল কয়েকটি দলের ভূমিকা অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই বলা হল। এ ছাড়া আরও কিছু দল এবং বহু ছোট বা আঞ্চলিক রাজনীতিক গোষ্ঠী ভারতীয় রাজনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নানাভাবে সক্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ মুসলিম লীগের কথা বলা যেতে পারে। জিন্না প্রমুখ নেতা বহু চিন্তার পরে ভারতীয় মুসলমানদের বলেছিলেন আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে। লীগের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান।[২৫] ছোট ছোট দল ও গোষ্ঠীগুলির কথা স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল না।

CENTRAL LIBRARY

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংগ্রামের সংগঠন ও ব্যাপ্তি

১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট সকাল থেকে সারা দেশে যে সংগ্রাম শুরু হয় তার অনেকটাই ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। কিন্তু এই বিরাট সংগ্রাম পুরোটাই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এরকম কথা বললে ভুল করা হবে। দেশের সর্বোচ্চ নেতারা জেলের মধ্যে থাকায় এবং অপর সর্বভারতীয় ও জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র এই সময়ে ভারতে উপস্থিত না থাকায় আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে মধ্যস্তরের নেতৃবৃন্দের উপরে। উপরন্তু গোপনে কড়া পুলিসী ব্যবস্থার মধ্যে বে-আইনীভাবে আন্দোলন পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তাঁদের ছিল না। তবুও তাঁরা যথাসাধ্য আন্দোলনকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। তার ফলে সারা দেশের জনগণের উপরে তাঁদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

অগস্ট আন্দোলনের প্রধানত দুটি দিক ছিল, এর একটি হল প্রকাশ্য গণ আন্দোলন—মিটিং, মিছিল, আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট বা হরতাল। দ্বিতীয়টি বৈপ্লবিক, এর মধ্যে ছিল রেলপথ, ডাক ও তার, টেলিফোন, সড়কপথ প্রভৃতি সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, থানা দখল করা, অস্ত্রাগার লুট করা, এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা ও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

নিরস্ত্র জনগণের সঙ্গে সরকারের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হবার মুহূর্ত থেকেই আত্মগোপনকারী এ.আই.সি.সি. কাজ শুরু করে। এ সম্পর্কে পৃ. ৬১তে আমরা আলোচনা করেছি। এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন পরিচালনার গোপন নির্দেশাবলী পাঠানো হত এবং নানা অঞ্চলের খবর সংগ্রহ করা হত। সমিতির নির্দেশাবলী সাধারণত বিনা প্রশ্নে পালন করা হত। কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণত প্রকাশ্য গণসংগ্রাম এবং বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলন—দুরকম কাজের নির্দেশই দেওয়া হত। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের এবং গণ-অভ্যুত্থানের দিকে নজর দেওয়া হত বেশী। বিজ্ঞপ্তি মারফত কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পরিচালন সমিতির তরফে শহরাঞ্চলে অনির্দিষ্টকালের জন্যে সাধারণ ধর্মঘট চালিয়ে যাবার আহ্বান জানানো হত। এবং সৈন্যবাহিনী এবং পুলিসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শ্রমিকদের রাস্তায় রাস্তায় এবং সমস্ত মহল্লায় কমিটি তৈরি করতে বলা হয়। তাছাড়া শিল্পে লাগাতর ধর্মঘট,

CENTRAL LIBRARY

সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি সবই হয়েছে। সারা ভারতে প্রায় সমস্ত অঞ্চলে শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘট পালিত হয়েছে। এর মধ্যে আহমেদাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, দিল্লী, জামসেদপুর, ইন্দোর, বাঙালোর, মহীশূর প্রভৃতি শহরের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। জামসেদপুরের লৌহ ইস্পাত কারখানায় সফল ধর্মঘট যুদ্ধের যোগানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বাধা সৃষ্টি করেছিল। একথা ভারত সচিব (Secretary of State) অ্যামেরির কাছে ভারতের বড়লাটের লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। এছাড়া আহমেদাবাদ এবং গুজরাটের অন্যত্র তিন মাসের বেশী ধর্মঘট চলে। মাদ্রাজে ৯০% শ্রমিক কাজ না করায় এবং বরোদা, ইন্দোর, নাগপুর ও দিল্লীতে স্বতোকল ধর্মঘটের ফলে সৈন্যবাহিনীর জন্যে অপরিহার্য খাকি বস্ত্রের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া সিগারেট শিল্প (কলকাতা, বোম্বাই, বাঙালোর, সাহারানপুর), রেলের পাটি উৎপাদন শিল্প (জয়পুর রাজ্য), চর্মশিল্প (কানপুর), গমজাত দ্রব্য উৎপাদন শিল্প (দিল্লী) প্রভৃতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন শিল্পে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এ কথা তৎকালীন ভারত সরকারের সরবরাহ দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যায়।

গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা শহরের থেকে অনুন্নত ছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে বৈপ্লবিক এবং নাশকতামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া বেশী সুবিধাজনক ছিল। মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও অস্থায়ী সরকার গঠনের কাজ মফস্বল অঞ্চলে বা জেলা শহরে করাই সম্ভবপর হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের নানা ধরনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল : ১। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রতিরোধ বাহিনীর মিছিল নিয়ে যাওয়া, ২। থানা ও পুলিস ফাঁড়ি আক্রমণ করা, ৩। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া, রেলের ফিশপ্লেট ও লাইন অপসারণ করা ও মালগাড়ি লাইনচ্যুত করা, ৪। রেল স্টেশন, রেল গুদাম, ডাকঘর, বিমান ঘাঁটি, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি দখল করা অথবা ধ্বংস করা, ৫। পুলিস এবং সৈন্যবাহিনীর যাতায়াতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করা প্রভৃতি।[১]

আরও কার্যকর প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থা বোম্বাইএ গোপন বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে। রামমনোহর লোহিয়া এবং জয়াভাই প্যাটেলের পরামর্শ ক্রমে বিঠলদাস (বাবুভাই) খাকার নামের এক ব্যক্তি এই বেতার কেন্দ্র তৈরি করেন। ১৯৪২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে

CENTRAL LIBRARY

১২ই নভেম্বর এই বেতার কেন্দ্র চালু ছিল। এরপর পুলিস এই কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে যায়।[২]

কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির নির্দেশের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির গোপন যুদ্ধ পরিষদ থেকে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে আলাদা নির্দেশাবলী পাঠানো হত। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস যুদ্ধ পরিষদ, উড়িষ্যা কংগ্রেস, অন্ধ্র কংগ্রেস প্রভৃতির পক্ষ থেকে থানা দখল, মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির খুঁটিনাটি নির্দেশ গোপন পুস্তিকা মারফত ছড়ানো হয়েছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৪২ সালের ৯ই নভেম্বর জেল ভেঙে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হন। এর ফলে সংগ্রাম পরিচালনায় যথেষ্ট সুবিধা হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সংগ্রামী জনগণের জন্যে রাজনীতিক, বৈপ্লবিক ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এইরকম একটি পুস্তিকাতে তিনি বিপ্লবের এলাকাগত সংগঠন নিয়ে আলোচনা করেন। বিপ্লবীরা তাঁদের কাজের সুবিধার জন্যে সারা ভারতকে অনেকগুলি জেলায় ভাগ করেছিলেন। এই জেলাগুলির প্রতিটিতে গড়ে আড়াইশ জনের গেরিলা বাহিনী গঠন করার কথা বলা হয়। জেলার বিপ্লবী বাহিনীগুলির নাম ঠিক হয় 'আজাদ দস্তা'। জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিকল্পনা ছিল যে এক একটি 'জাঠা' বা গেরিলা দলে পঞ্চাশ জন করে বিপ্লবী নিয়ে মোট পাঁচটি 'জাঠা' তৈরি হবে। প্রত্যেক বিপ্লবী নিজের নামের সঙ্গে 'আজাদ' উপাধি ব্যবহার করবেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ বিপ্লবীদের প্রধানত তিন ধরনের কাজ করার কথা বলেন। এগুলি হল—যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা, সরকারী কোষাগার লুঠ ও সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা এবং শত্রুপক্ষের ঘাঁটি দখল করা। তিনি সব সময়েই কোনো না কোনো কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তবে প্রাণহানি অথবা আঘাত না করার জন্য আজাদ দস্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি যে তিন ধরনের কাজের কথা বলেন তার সঙ্গে এই ধরনের নির্দেশ একই সঙ্গে পালন করা বহুলাংশেই অসম্ভব বলে মনে হয়। মনে হয় গণ অভ্যুত্থানের সঙ্গে অহিংসার সমন্বয় ঘটাতে গিয়েই তাঁকে এরকম নির্দেশ দিতে হয়েছিল।

গেরিলারা সব সময়েই অস্ত্রের স্বল্পতার জন্যে অসুবিধা বোধ করতেন। নানা পদ্ধতিতে তাঁদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে হত। যেমন থানা ও অস্ত্রাগার লুঠ করা, রেলপথে অস্ত্রের চালান লুঠ করা, কখনও কখনও সৈন্যবাহিনীর

CENTRAL LIBRARY

অস্ত্রের গুদাম লুঠ করা, বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া, নেপাল থেকে (বিহারের জন্যে) অস্ত্র আনা, এলাকায় এলাকায় বোমা এবং গ্রেনেড তৈরি করা এবং প্রধানত রেল লাইন ও রেল গুদাম লুঠ করে ইস্পাত সংগ্রহ করে তাই দিয়ে ধারালো অস্ত্র তৈরি করা প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে খুব সামান্য অস্ত্রই বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো সম্ভবপর হয়েছিল।

সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনের জন্যে কংগ্রেসের নামে অর্থ দিতে ব্যবসায়ীরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পরে গেরিলা দলগুলি টাকা সংগ্রহ করার জন্যে রাজনীতিক ডাকাতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত।[৩]

অগস্ট আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশে এত ব্যাপকভাবে সমস্ত বয়সের এবং সমস্ত শ্রেণীর ছাত্ররা আন্দোলনে অংশ নেয় যে সেটা ছিল অভূতপূর্ব। "১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তাদের অংশ খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন তাদের নাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু ১৯৪২ সালের সংগ্রাম তাদের এমনভাবে উজ্জীবিত করেছিল যা অতীতে কখনও হয়নি। এর আগে পর্যন্ত গান্ধীজীর দর্শন এবং তাঁর আপাত জটিল রাজনীতি তাদের বোধগম্য হত না। তারা পশ্চিমী ভাবধারা এবং মতাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর কর্মকাণ্ড এবং বিপ্লবী ভূমিকা তাদের আকৃষ্ট করেছিল।" (কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটি রিপোর্ট)।[৪]

কোচিনের মত আরও কয়েকটি জায়গায় সংগ্রামরত ছাত্রদের অভিভাবকদের সরকার চাকরী থেকে বরখাস্ত করা বা ব্যবসার উপরে চাপ সৃষ্টি করার হুমকি দেয়। ছাত্ররা সবরকম কাজকর্মেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কংগ্রেস রিপোর্টে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে বলা হয়।

একথা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের মত গ্রামাঞ্চলের চাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামে অংশ না নিলে গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। গেরিলা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে বিপ্লবীদের আশ্রয় দান, খবর সরবরাহ, ধ্বংসাত্মক গোপন কাজকর্ম প্রভৃতি সব ধরনের কাজের মধ্যেই নানা স্তরের

CENTRAL LIBRARY

চাষীরা ছিলেন অগ্রণী। গ্রামীন সর্বহারারাও আন্দোলন থেকে বাদ যান নি। এর ফলে তাঁদের উপরে চূড়ান্ত নিপীড়ন চালানো হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে (**Council of State**) সরকারী মুখপাত্রের বিবৃতি অনুযায়ী বিহার, বাংলা এবং উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংগ্রামী জনগণ রেল ব্যবস্থা অচল করে দেয়। অনেকদিন বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। অপরদিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও রেলপথ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মাদ্রাজের সঙ্গে দেশের অপরাপর অংশের সংযোগ ব্যাহত হয়।[৫]

সংগ্রামের প্রবল স্রোত শুধু ব্রিটিশ ভারতেই আবদ্ধ ছিল না। দেশীয় রাজ্যের জনগণের উপরেও তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দেশীয় রাজ্যের জনগণের সংগঠনগুলি প্রজামণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। হায়দরাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, ইন্দোর, গোয়ালিয়র এবং উদয়পুর রাজ্যের প্রজামণ্ডলের কার্যকরী সমিতিগুলির পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত রাজ্যের নৃপতিদের কাছে জনগণের আন্দোলনে বাধা না দিয়ে সহায়তা করার জন্যে আবেদন করা হয়। এর পরেই এই সব রাজ্যের নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের দাবীতে অনুষ্ঠিত সভা সমাবেশের উপর লাঠি এবং গুলি চালনা শুরু হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর এবং বরোদায় আন্দোলন সবচেয়ে জঙ্গী চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। উড়িষ্যার কোনো কোনো ছোট রাজ্যে স্বাধীন সরকার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া জয়পুর আর কাশ্মীর রাজ্যের শাসকরা জনগণের সংগ্রামে কোন বাধা দেন নি। প্রকাশ্যেই প্রজারা এসব রাজ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করতে পারতেন। কোনো কোনো রাজ্যের রাজারা প্রজাদের আন্দোলনে বাধা দিতে না চাইলেও ঐসব রাজ্যের ব্রিটিশ রেসিডেন্টরা রাজাকে পরোয়া না করে নিজেরাই গুলি চালাবার নির্দেশ দেন। মহীশূর এরকম একটি উদাহরণ।[৬]

'ভারত ছাড়ো' সর্বভারতীয় গণসংগ্রাম হওয়ায় উপরে উল্লিখিত শ্রেণীগুলি এবং পূর্ববর্ণিত অঞ্চল, প্রদেশ ও রাজ্যের বাসিন্দারা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর এবং সারা ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মানুষই এর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে স্বরাজ বা স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশেষ করে পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বালিয়া জেলা প্রভৃতি এলাকার স্বাধীন সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব সরকারের অস্তিত্ব খুব ক্ষণস্থায়ী ছিল। ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনী ও পুলিসের যুগ্ম আক্রমণে মুক্তাঞ্চলগুলি পুনরাধিকার করে। দু'একটি জায়গায় সরকার তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়।[৭]

জনগণের পক্ষ থেকে যে আক্রমণ চালানো হয় তার ফলাফলগত পরিসংখ্যান সারণী ৬'১ এবং সারণী ৬'২ তে দেওয়া হল। এরমধ্যে সরকারী নির্যাতনের হিসাব দেওয়া হল না। তার জন্যে পৃথক তালিকা সারণী ৬'৪ দ্রষ্টব্য।

অগস্ট সংগ্রামে বাংলা

বিহারে অগস্ট আন্দোলন যতখানি তীব্রতা ও ব্যাপকতা লাভ করেছিল বাংলাতে তার থেকে কম হলেও বাংলার নানা জেলায়, বিশেষত মেদিনীপুরে সংগ্রাম প্রচণ্ড রূপ নেয়। এই সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকাকে সর্বভারতীয় বিচারে কোন কোন ভাষ্যকার ও অংশগ্রহণকারী ফরাসী বিপ্লবে প্যারিসের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৮] মেদিনীপুর ছাড়া কলকাতা, হাওড়া, বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ঢাকা, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলা ও মহকুমাতেও সংগ্রাম রীতিমত উগ্র চেহারা নেয়। সমগ্র বাংলায় হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াল্লিশবার গুলি চালানো হয়, যার ফলে শত শত মানুষ নিহত হন। এছাড়া লাঠি চালানো, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া, বাড়ি-ঘর জালিয়ে দেওয়া, শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা, ধর্ষণ ও নারী হত্যা করা, আন্দোলনের এলাকায় ব্যাপক লুঠতরাজ ইত্যাদি সবই আন্দোলন দমনের নামে করা হয়েছিল। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যে শুধু বাংলার অধিবাসীদেরই হয়েছে তা নয়। বস্তুত ভারতের যেখানেই অগস্ট সংগ্রামের ঢেউ পৌঁছেছে সেখানকার অধিবাসীদের এরকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। বাংলার মানুষ যে জঙ্গী সংগ্রামের থেকে পেছিয়ে ছিল না তা নীচে প্রদত্ত সারণী ৬'৩ থেকেই বোঝা যাবে।

CENTRAL LIBRARY

সারণী—৬.২
অগস্ট সংগ্রামের সর্বভারতীয় অগ্রগতি

(ক)	**রেল**		
১।	ধ্বংস প্রাপ্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত রেলস্টেশন—		৩৩২
২।	১৯৪২ সালের ১ অক্টোবর থেকে রেললাইন দারুণ ভাবে ক্ষতি করার ঘটনা*	—	৪১১
৩।	রেলগাড়ির কামরা, ইঞ্জিন, ইত্যাদি ক্ষতি করার ঘটনা	—	২৬৮
৪।	নাশকতামূলক কাজের ফলে ট্রেন লাইন-চ্যুত হওয়া এবং অন্যান্য ধরনের দুর্ঘটনা	—	৬৬
৫।	টাকার অঙ্কে রেল সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ	—	৫২,০০,০০০
(খ)	**ডাক ও তার বিভাগ**		
১।	ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ডাক-তার ঘর, ছোট ডাকঘর প্রভৃতি	—	৯৪৫
২।	টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি লাইন ধ্বংস করার ঘটনা	—	১২,২৮৬

---

*১৯৪২ সালের ১ অক্টোবরের আগে রেলপথের ক্ষতি এত ব্যাপকভাবে হয় যে সেরকম ঘটনার সঠিক সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব। এই সময়ের মধ্যে রেলপথের ক্ষতি পরের সময়কার তুলনায় অনেক বেশী, আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকার সমান।

সূত্র :—সারণী ৫·১ এর মতো।

সারণী—৬.৩
বাংলায় অগস্ট সংগ্রাম

বিষয়		সংখ্যা
১।	শ্রমিক ধর্মঘট	৪০
২।	গণ আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত থানা	১১
৩।	গণ আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ঋণ নিষ্পত্তি বোর্ড	২১

	বিষয়	সংখ্যা
৪।	ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিঅন বোর্ড	৫৭
৫।	,, ,, ,, ডাকঘর	১১৮-র বেশী
৬।	,, ,, ,, আদালত	৬
৭।	,, ,, ,, আফগারী দোকান	২৬
৮।	,, ,, ,, ট্রামগাড়ি	১৮
৯।	,, ,, ,, টেলিফোনের তার	৬৯টি এলাকা
১০।	,, ,, ,, রেলপথ	১৬টি জায়গা
১১।	,, ,, ,, রেল ও ষ্টীমার স্টেশন	১৪
১২।	,, ,, ,, জমিদারী কাছারি	১৮
১৩।	,, ,, ,, অন্যান্য সরকারী অফিস	৭৪
১৪।	দখলীকৃত সরকারী অস্ত্র	১৩টি বন্দুক, ২টি তলোয়ার।
১৫।	,, ,, বাড়ি ও জমি	
	(যে সব অফিসে পতাকা তোলা হয়েছে সেগুলি সমেত)	৬১

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় সুষ্ঠু পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্দোলন চালানো হয় এবং সংগ্রামকারীরা শীঘ্রই মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, তমলুক, পাঁশকুড়া, ময়না প্রভৃতি থানা দখল করে নেয় এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান দখল করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন সরকার, প্রশাসন, জাতীয় সেনাবাহিনী (এর নাম ছিল 'বিদ্যুৎ বাহিনী'), জাতীয় পুলিস, জাতীয় আদালত, জেল সেবা বিভাগ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীন সরকার নিজস্ব মুখপাত্র 'বিপ্লবী' প্রকাশ করতে থাকে। এই জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। তিনি ছাড়াও অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া, এম. সি. সাহু প্রমুখ অন্যান্য নেতা ছিলেন। মেদিনীপুরকে এই সংগ্রামের জন্যে প্রভূত মূল্য দিতে হয়। সরকারী তরফে শুধু পুলিসি নির্যাতন যথেষ্ট ছিল না। ১৯৪২ সালের ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর অভূতপূর্ব সাইক্লোনের শিকার হলে যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সৃষ্টি হয় তার সুযোগে এই জেলার মানুষদের 'শিক্ষা' দেবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার বন্যা ও ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত মেদিনীপুরে কোন রকম সাহায্য ও ত্রাণ জেলার বাইরে থেকে পাঠানো নিষিদ্ধ করে দেয়।[৯]

বাংলার বিভিন্ন জেলার আন্দোলনে, বিশেষত উত্তরবঙ্গে সাঁওতাল ও

অন্যান্য আদিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি বাদে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের মতই বাংলাতেও মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ অগস্ট সংগ্রামে অংশ নেন নি। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রভাবের ফলে সরকার বাংলায় প্রধানত উত্তর-বঙ্গের বালুরঘাট মহকুমায় মুসলমানদের সংগ্রাম দমন করার কাজে ব্যবহার করতে পেরেছিল।[১০]

সরকারী প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই অগস্ট আন্দোলনকে সমস্ত শক্তি দিয়ে দমন করবে ঠিক করে এবং সেই অনুযায়ী '৪২ সালের ৯ অগস্ট ভোর থেকেই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বড় নেতা গ্রেপ্তার হন। কেবল আত্মগোপনকারী নেতারাই কিছুদিনের জন্যে গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। সরকার অনতিবিলম্বে কংগ্রেস এবং তার সহযোগী সমস্ত সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহারে কংগ্রেসকে একতরফাভাবে সবকিছুর জন্যে দায়ী করা হয়। এতে সরকার 'বিশৃঙ্খলা' ও 'উৎপাত' দমনের জন্যে যে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে তার হুমকি দেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করার দায়িত্বও কংগ্রেসের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সামরিক আইন জারি না করেও সরকার কার্যত সারা ভারতে ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তোলে। গণঅভ্যুত্থান দমনের জন্য অনেক নতুন অর্ডিন্যান্স এবং বিশেষ আইন তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ শাস্তিদান অর্ডিন্যান্স (**Penalties Enhancement Ordinance**), যৌথ জরিমানা অর্ডিন্যান্স, বিশেষ আদালত অর্ডিন্যান্স, বেশাঘাত অর্ডিন্যান্স (**Whipping Ordinance**) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। এই সব আইনের নামে লুঠ-পাট, চাবুকমারা, খুন করা, প্রভৃতিকে আইনসিদ্ধ করা হয়। বিশেষ আদালতে বহু মানুষকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে পাইকারী হারে অসংখ্য মানুষকে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[১১] সেইসময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সরকারী প্রশাসন বিভাগ আন্দোলন দমন করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের বেআইনী, বর্বর ব্যবস্থা নিয়েছিল। পরবর্তী কালে আইন পাস করে এই ধরনের কার্যকলাপকে বৈধ রূপ দেওয়া হয়।[১২]

সরকারপক্ষ থেকে আন্দোলন দমন করার নামে জনগণকে 'শিক্ষা' দেবার

যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার মধ্যে কয়েক ধরনের অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ধর্ষণ এবং বিভিন্ন পৈশাচিক পদ্ধতিতে নারী নির্যাতন, ঘরবাড়ি জালিয়ে দেওয়া প্রভৃতির সঙ্গে বহু জায়গায় বিমান থেকে মেশিনগান চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জমায়েত হওয়া বহু মানুষকে খুন করা হয়। শুধু ১৯৪২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৩-এর ১০ ফেব্রুআরির মধ্যে কলকাতা, চট্টগ্রাম এবং ফেণীতে আকাশ থেকে গুলি করে ৩৪৮ জনকে হত্যা করা হয় এবং ৪৫৯ জনকে জখম করা হয়।[১৩] একটা জায়গায় রেললাইন মেরামত করার মজুরদের বিক্ষোভকারী ভেবে তাদের উপরেও বিমান থেকে গুলি চালানো হয়। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৪২ সালের আন্দোলনে পুলিস এবং সৈন্যবাহিনীর গুলিতে ১,০২৮ জন নিহত এবং ৩,২০০ জন আহত হন। অপরদিকে বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ২৫,০০০ এর কম ছিল না। জহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত অভিমত অনুযায়ী এই সংখ্যা সম্ভবত ছিল ১০,০০০ এর কাছাকাছি।[১৪] কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বহুক্ষেত্রে পুলিস জনগণের উপরে লাঠি বা গুলি চালাবার হুকুম অস্বীকার করেন। বিশেষ করে বিহারে কিছু পুলিস অন্দোলনকারী জনগণের সঙ্গে যোগ দেন। প্রত্যেক প্রদেশেই কিছু পুলিস অফিসার ও পুলিসকর্মী কাজে ইস্তফা দেন। পুলিস ও সৈন্যদের বশে রাখবার জন্যে সরকার থেকে তাদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সরকার বিদ্রোহী পুলিস ও সৈন্যদের তৎক্ষণাৎ শাস্তি দিতেও ভয় পাচ্ছিল। বরং এ ধরনের বিদ্রোহী মনোভাবের খবর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়। এছাড়া কোন প্রদেশ থেকেই পুলিস বা সামরিক বাহিনীতে লোক নিয়োগ করে সরকার নিশ্চিত ছিল না, তানের নিশ্চিতভাবেই অন্য প্রদেশে বদলি করা হত। সারণী ৬'৪ এ অগষ্ট আন্দোলনের উপরে সরকারী দমনের পরিসংখ্যানগত চিত্র দেওয়া হল।

সংবাদপত্রের উপরে দমন

১৯৪২ সালের ১১ই অগস্ট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এতে সংবাদপত্রগুলিকে দমন করার জন্যে নতুন আরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। 'দিল্লী চুক্তি'র ফলে কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা নিতে গেলে আগে ঐ পত্রিকাকে সতর্ক করে দেওয়া বা 'প্রেস

CENTRAL LIBRARY

অ্যাডভাইসারি কমিটি'কে জানাবার যে রীতি ছিল তা রদ করে দেওয়া হয়। এছাড়া সংবাদ প্রকাশ এবং সাংবাদিক বৃত্তি সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। যে কোন পত্রিকা-সম্পাদকের পক্ষে কংগ্রেস সমর্থক হওয়াটাও একটা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। সরকারী দমন বা পুলিসি অত্যাচারের ছবি বা সে সম্পর্কে খবর, মতামত, কার্টুন প্রভৃতি ছাপা নিষিদ্ধ হয়। সারা দেশের বহু পত্রপত্রিকা এর প্রতিবাদে তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে কলকাতার পনরটি পত্রিকা যথা 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'ভারত', 'হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড', 'বসুমতী', 'দৈনিক কৃষক', 'মাতৃভূমি', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজে[১৫] 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস', 'অন্ধ্র টাইমস', 'দিনমণি', 'নবযুগম' প্রভৃতি তামিল ও তেলেগু পত্রিকা এবং অহমেদাবাদ, বোম্বাই ও লখনউ-এর পত্রিকাগুলিসমেত সারা দেশের ৯৬টি পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর সম্পাদক দেবদাস গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১৬]

গান্ধীজীর ভূমিকার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন

অগস্ট সংগ্রাম সম্পর্কিত কংগ্রেস তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গান্ধীজী গভীর চিন্তার পরে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে যদি অংশ নিতে হয় বা বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে হয় তবে ব্রিটিশ সরকারের সর্বাগ্রে ভারত ছাড়া প্রয়োজন। এর কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধান্তে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এছাড়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানীদের জয়, ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের ক্রমান্বয়ে স্বৈরতন্ত্রী রূপান্তর, যুদ্ধের নামে ভারত-বাসীকে পীড়ন করে যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ, ভারতবাসীর স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটেনের ব্যবহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রজাতন্ত্রের অসন্তোষ প্রভৃতি ঘটনার প্রভাব গান্ধীজীর উপরে গভীরভাবে পড়েছিল।[১৭] কিন্তু গান্ধীজী যে '৪২ সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরোধী ছিলেন একথা আমরা জানি। কেবল অগস্ট আন্দোলনের শেষে ১৯৪৪ সালে যখন তিনি সরকারের সঙ্গে আপস মীমাংসার কথা বলেন তখন তিনি যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন।[১৮] এর থেকে একথা মনে হতে পারে যে কংগ্রেস রিপোর্টে শুধু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়নি বরং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধীজীর নামে তুলে ধরা হয়েছে।

কংগ্রেস তদন্ত রিপোর্টে কেবল গান্ধীজীর উপরে প্রভাব বিস্তারকারী

CENTRAL LIBRARY

আন্তর্জাতিক কারণগুলির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এগুলি ছাড়া ভারতীয় রাজনীতির কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল? অগস্ট আন্দোলনের সময়কার কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মতে প্রথমত, গান্ধীজীর এই ধারণা জন্মেছিল যে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগ এবং অক্ষশক্তির সহায়তা লাভ গান্ধীজীর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর আগেকার সমালোচনামূলক মনোভাব ক্রমেই গুণগ্রাহিতায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। তৃতীয়ত, গান্ধীজী ধারণা করতে পারেন নি যে আন্দোলন শুরু হতে না হতেই সরকার সমস্ত শক্তি দিয়ে আন্দোলন দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বরং তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি ধীরেসুস্থে নিজের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। আন্দোলন শুরু করার অব্যবহিত আগেও তিনি নিজে প্রতিরোধের পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা গড়ে তুলতে পারেননি। কারণ গান্ধীজী ভেবেছিলেন বোম্বাইয়ে এ. আই. সি. সি.-র সভায় আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের পরে (৮ অগস্ট '৪২) তিনি ধীরে ধীরে আন্দোলনে গতি সঞ্চার করবেন। ৯ অগস্ট ভোরবেলাতেই পুলিস গান্ধীজী সমেত প্রথম সারির প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করায় পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যে মূল্যায়ন করেছিলেন তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, এবং মৌলানা আজাদের মতে দমনের আকস্মিকতায় গান্ধীজী বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।[১৯] তিনি আন্দোলন শুরু করবার আগে বড়লাটকে যে চূড়ান্ত পত্র দেবেন ভেবেছিলেন তা আর হয়ে ওঠেনি।

টোটেনহ্যামও গান্ধীজীর আচরণ পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একই ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, গান্ধীজীর ধারণা হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার ভারতে জাপানী আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না। বরং ভারতকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে তারা জাপানের হাতে পরাজিত দেশ হিসেবে ছেড়ে যাবে। এরকম হলে স্বরাজের স্বপ্ন সফল হবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভগ্নতরীর সঙ্গে ডুবে গেলে আত্মরক্ষার স্বাধীন অবকাশটুকুও থাকবে না। এমন অবস্থার চেয়ে আভ্যন্তর বিশৃঙ্খলাও ভাল। এইসব কারণে গান্ধীজীর হয়ত মনে হয় যে ভারতে ব্রিটিশ না থাকলে কংগ্রেস একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারে। এই ধরনের কিছু ভাবনাচিন্তা হয়ত তাঁর ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পিছনে ছিল। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

উইকেনডেন মনে করেন যে প্রবল যুদ্ধবিরোধী মনোভাবই গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আহ্বানের কারণ। এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্নর স্যার টোয়াইনাস-এর মতে গান্ধীজী যে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান মেনে নিয়েছিলেন তার কারণ এর বিনিময়ে তিনি নেহরু ও আজাদকে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব সম্পর্কে রাজী করাতে পেরেছিলেন। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিনলিথগোর মতে "মহাত্মা গান্ধী যে হিংস্র ভাষা (**violent language**) ব্যবহার করতেন তা ভালো রকমের 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ' ছাড়া আর কিছু ছিলনা এবং সব সময়ে সেইসব কথা অনুযায়ী কাজ হত না।" তিনি গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব এবং সংশ্লিষ্ট বক্তৃতা সম্বন্ধে এ কথা বলেন। গান্ধীজীর সচিব পিয়ারীলালের বক্তব্য অনুযায়ী 'ভারত ছাড়ো' এই শব্দটিও নাকি গান্ধীজীর নিজের উদ্ভাবিত নয়। অগস্ট আন্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত আগে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের সময়ে ঐ সাংবাদিক এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে এটিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গান্ধীজী নিজে যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন সেটি নাকি ছিল 'বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ প্রত্যাহার' (**orderly British withdrawal**)।[২০]

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়া ক্রমবর্ধমান জনমতের চাপ ও সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের সংগ্রামী মনোভাবও সম্ভবত গান্ধীজীর আচরণ পরিবর্তনের জন্যে দায়ী ছিল।

আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ও পরিণাম

৯ অগস্ট, ১৯৪২ মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, আসফ আলী, সৈয়দ মামুদ, আচার্য কৃপালনী, শংকর রাও দেও প্রমুখ নেতাদের আহমেদনগর কারাদুর্গে বন্দী করে পাঠানো হয় এবং তাঁদের সৈন্য বিভাগের হেফাজতে রাখা হয়। এছাড়া গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রাসাদে আটক করা হয়। এইখানে ১৯৪৩ সালের শুরুতে গান্ধীজী একুশ দিনের জন্যে আত্মশুদ্ধিমূলক অনশন শুরু করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক হয়ে ওঠায় বড়লাট তাঁকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য আটক নেতাদের কাছে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল। মৌলানা আজাদের ধারণা হয় যে এই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এত বেশী পরিবর্তন হয় যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গান্ধীজীকে মুক্তিদানে ভয়ের কিছু সম্ভাবনা ছিল না। অন্যান্য নেতারা যখন জেলে, তখন মুক্তি

CENTRAL LIBRARY

পেয়ে গান্ধীজী খুব সামান্য কাজই করতে পারতেন। অপরদিকে জেলখানার বাইরে তাঁর উপস্থিতির ফলে যারা সহিংস পন্থায় আন্দোলন চালাবার চেষ্টা করছিল তাদের উপরে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ হতে পারে।[২১] মুক্তি-লাভের পরে গান্ধীজী দুটি প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রথমত, তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনার চেষ্টা শুরু করেন। গান্ধীজী আন্দোলনের হিংসাশ্রয়ী ঘটনাবলীর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু এটা যে সরকারী অত্যাচার এবং দমনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে কথাও বলেন।[২২]

গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে নিজের উদ্যোগে যে আলোচনা শুরু করেন সে ব্যাপারে হিন্দু ও শিখ জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। কারণ এই আলোচনা ছিল পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপদানকে কেন্দ্র করে।[২৩] তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের মতে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজীর এই আলোচনা ছিল 'বিরাট এক রাজনীতিক ভুল'। তাঁর মতে গান্ধীজী জিন্নার রাজনীতিক গুরুত্ব না বুঝে এইভাবে তাঁকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। জিন্না বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কংগ্রেস ত্যাগ করার পরে তাঁর রাজনীতিক গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। গান্ধীজী আকস্মিক-ভাবে গুরুত্ব দেওয়াতেই ভারতের মুসলমানদের বৃহৎ অংশ তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে-ছিল বলে মৌলানা আজাদের বিশ্বাস ছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে গান্ধী-জিন্না আলোচনা নিষ্ফল হয়। যদিও আজাদের মতে জিন্না তাঁর নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধির স্বার্থে এই আলোচনাকে পূর্ণ ব্যবহার করেন।[২৪]

গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার পূর্বশর্ত হিসাবে একথা ঘোষণা করেন যে যদি ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয় তবে ভারত স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ পক্ষ নেবে এবং যুদ্ধে সহযোগিতা করবে (নিউজ ক্রনিকল্-এ প্রদত্ত বিবৃতি)। গান্ধীজীর এই বিবৃতির সঙ্গে তাঁর আগেকার যুদ্ধবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, বরং এই পরিবর্তনকে আকস্মিক বলে বোধ হয়। এই বিবৃতির ফলে দেশের মধ্যে ও বাইরে অনেকে তাঁকে ভুল বোঝেন।[২৫]

কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হলেও ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয় নি এবং তাঁরা বিভেদনীতির মাধ্যমে শাসন করার নীতি অনুযায়ী ১৯৪৫ সালের ২৫ জুন সিমলায় একুশ জন নেতার উপস্থিতিতে

CENTRAL LIBRARY

সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বড়লাটের কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যাতে তার মধ্যে ভারতের প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে। এই সম্মেলনের আগে কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কংগ্রেস এই সময়ে সংগ্রামের পথ পুরোপুরি বর্জন করে এবং ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনা ও বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত যথাক্রমে ওআর্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশনে সিমলা সম্মেলনের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য গান্ধীজী নিজে রাজনীতিক কার্যকলাপের পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগের পক্ষে ছিলেন। এ. আই. সি. সি.-তে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আটক বন্দীদের মুক্তির জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়। এরপর বন্দীরা পর্যায়ক্রমে মুক্তি পান।

অপরদিকে যে সব রাজনীতিক কর্মী বা নেতা গোপন আন্দোলনের মধ্যে ছিলেন অন্তর্বর্তী সময়ে সরকারী দমনের পাশাপাশি তাঁদের অন্য ধরনের মানসিক চাপ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কট্টর অহিংসবাদীরা পরিচালকমণ্ডলীর (**Directorate**) দিল্লী বৈঠকে বহু গোপন ও ধ্বংসাত্মক কাজের সমালোচনা করেন। সি. এস. পি. নেতারা সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গান্ধীবাদী নেতাদের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হন। তাঁরা এই কারণে একই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক এবং অন্য ধরনের কাজকর্ম পাশাপাশি চালাবার প্রস্তাব দেন।

গান্ধীবাদী নেত্রী সুচেতা কৃপালনী সরকারী অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন। গান্ধীজী হিংসাশ্রয়ী কাজের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আপত্তির কথা সুচেতা কৃপালনীকে জানান। এরপরে যখন সাদিক আলী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন গান্ধীজী তখন তাঁকে বলেন যে প্রত্যেককে তার নিজের বিবেক অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, কাজেই তিনি কোন অসন্তোষ প্রকাশ করছেন না, কিন্তু তিনি নিজে ধ্বংসাত্মক ও হিংসাশ্রয়ী কাজের বিরোধী।

এরপরে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং গান্ধীবাদী গোষ্ঠী অবস্থা পর্যালোচনার জন্যে বোম্বাইয়ে পরিচালকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করে। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন সাদিক আলী ও সুচেতা কৃপালনী। অন্যদিকে সহিংস

CENTRAL LIBRARY

সংগ্রামপন্থীদের নেতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুণা আসফ আলী প্রমুখ। আপাত মিটমাটের জন্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ দুই থেকে তিন মাসের জন্যে সহিংস আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রস্তাব দেন, কিন্তু এর ফলে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ কমেনি। বরং ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীবাদী গোষ্ঠী আলাদা হবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুচেতা কৃপালনী কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন। এরপরে গান্ধীবাদী গোষ্ঠী 'সারা ভারত সত্যাগ্রহ পরিষদ' গড়ে তোলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন সুচেতা কৃপালনী। এই পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯৪৪ সালের ১৩ই মে একটি বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে গান্ধীজীর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত আক্রমণাত্মক কর্মসূচী বন্ধ থাকবে। এই বছরে ৯ অগস্ট পালনের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গান্ধীবাদী গোষ্ঠী পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরি, চরকা কাটা এবং 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাঠের মাধ্যমে ৯ অগস্ট পালন সীমাবদ্ধ রাখেন। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলীর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল হরতাল বা বন্ধ্ পালন, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা, সরকারকে খাদ্যশস্য বিক্রি না করা, সৈন্য বিভাগে অসন্তোষ গড়ে তোলা, প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী গান্ধীজীর সহানুভূতি লাভ করেনি। বরং গান্ধীজী দেশব্যাপী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের জন্যে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের দায়ী করেছিলেন। আন্দোলনের অনেক নেতা গোপনে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। বিপরীত শিবির থেকে আত্ম-গোপনকারী নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা এবং চরিত্র হনন করার জন্যেও আক্রমণ চালানো হয়। এর ফলে তাঁদের অনেকেরই মন ভেঙে যায়। অবশ্য ১৯৪৫ সালের ১৫ই জুন কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সদস্যরা ছাড়া পাবার পরে তাঁদের মধ্যে জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল আত্মগোপনকারী নেতাদের খোলাখুলি প্রশংসা করেছিলেন।

এই বছর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির সভায় এই মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে নেতৃত্বহীন জনগণ কিছু কিছু বীরত্বপূর্ণ কাজ করলেও '৪২-এর অগস্ট আন্দোলনকে কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। এর কারণ এই আন্দোলন ছিল ধ্বংসাত্মক, অহিংস নয়। প্রস্তাবে ১৯২০ সাল থেকে অনুসৃত অহিংস আন্দোলন পদ্ধতিকেই কংগ্রেসের দিশা হিসাবে আবার

ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবে অগস্ট সংগ্রাম সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যেন ক্ষমাপ্রার্থীর।[২৬]

এইভাবে অগস্ট সংগ্রাম জনগণের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ফলদানে ব্যর্থ হয়।

CENTRAL LIBRARY

সপ্তম অধ্যায়
আজাদ হিন্দ্ সংগ্রাম

সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগ

১৯৪০ সালে সি. এস. পি. এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হবার পরে ফরওআর্ড ব্লক যথেষ্ট একা হয়ে যায় এবং আলাদা ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচার চালাতে থাকে। সংগ্রামী পথে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ফরওআর্ড ব্লকের উদ্‌যোগে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তথাকথিত 'অন্ধকূপ হত্যা' গল্পের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ব্রিটিশ সরকার এই মনুমেণ্ট বানিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সংহতির পক্ষে এই আন্দোলন বিশেষ কার্যকরী হবে বলে সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল। ১৯৪০ সালের ২ জুলাই আন্দোলন পরিচালনার সময়ে তিনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর মুক্তির আশা খুবই কম। ফলে তিনি মুক্তির দাবীতে ঐ বছরের ২৯ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার গুরুতর অবনতি হওয়ায় ৫ ডিসেম্বর তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে স্বগৃহে অন্তরিত রাখা হয়। এই সময়ে তিনি আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত কারণে নিজের ঘরে প্রায় সমস্ত মানুষের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতেন। নিজের পরিবারেরও কেবল অল্প কয়েক-জনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। ব্রিটিশ পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ বাইরে থেকে তাঁর উপরে নজর রাখার কাজ করত।

আসলে এই সময়ে তিনি সংগোপনে ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করছিলেন। অবশেষে ১৯৪১ সালের ১৭ জানুআরি মাঝরাতে তিনি মৌলবী জিয়াউদ্দীন ছদ্মনামে পাঠানের বেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। বিহারের গোমো পর্যন্ত মোটর গাড়িতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে পেশোয়ার যান। সেখান থেকে রহমৎ খান ছদ্মনামে ভগৎরাম তলোয়ার-এর সহযোগিতায় অত্যন্ত বিপদসংকুল পথে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে উপজাতীয় গ্রামের মধ্যে দিয়ে কাবুল পৌছন। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিঅনে রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু কাবুলে যে কোন সময়ে ধরা পড়ে যাবার সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে চারদিন কাটাবার পরেও তাঁদের সোভিয়েত দূতাবাসের

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গে যোগাযোগ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এমনকি রাস্তায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের গাড়ি থামিয়ে তাঁকে নিজের কথা বোঝাবার চেষ্টা করেও তাঁরা ব্যর্থ হন। পঞ্চম দিনে ইটালিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র উত্তমচাঁদ মালহোত্রার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি আরও কয়েকবার সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে দেড়মাস আত্মগোপন করে থাকার পরে ১৮ মার্চ সুভাষচন্দ্র সেনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা ছদ্মনামে ইটালিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে রেলপথে মস্কো পৌঁছন এবং সেখান থেকে ২৮ মার্চ বিমানপথে বার্লিন যাত্রা করেন[১]।

জার্মানীতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

সুভাষচন্দ্র রোমে মুসোলিনির কাছ থেকে সমাদর পান এবং মুসোলিনি তাঁকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু জার্মানীতে হিটলারের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যে খুব সহজ হবে না এ আশঙ্কা সুভাষচন্দ্রের ছিল। তিনি বিদেশের মাটিতে ভারতীয়দের নিয়ে জাতীয় সৈন্যদল এবং অস্থায়ী জাতীয় সরকার গড়ে তুলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনার পিছনে প্রধানত তিনটি নীতি ছিল। এগুলি হল: ১। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র, ২। স্বাধীনতা আপসরফার মাধ্যমে ভিক্ষা পাওয়া যায় না, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা অর্জন করতে হয়, ৩। ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতাও বেশীদিন রক্ষা করা যায় না, যদি দেশ স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে এবং যে কোন মূল্যে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে প্রস্তুত না থাকে।[২]

হিটলারের ভারতীয় জাতির সম্পর্কে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা সুস্পষ্ট ছিল। আত্মজীবনীতেও সে কথা জাতিবাদী হিটলার স্পষ্ট ভাষায় লেখেন। তিনি ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের সমর্থক ছিলেন। শুধু বিশ্বযুদ্ধের সুযোগেই সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে প্রবেশের অধিকার লাভ করতে সমর্থ হন। সুভাষচন্দ্র জার্মানী পৌঁছে প্রথমেই হিটলারের আত্মজীবনীতে (**Mein Kampf**) লেখা ঘৃণা-ব্যঞ্জক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে ঐ কথা প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং হিটলার বইটি থেকে ঐ লাইনগুলি বাদ দিয়ে দেন[৩]। এর আগে ১৯৩৫ সালে যখন সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে আসেন তখন তাঁর সফর ছিল বেসরকারী, ফলে নাৎসি পার্টি ইহুদি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্য রাজনীতিক

CENTRAL LIBRARY

বিরোধী গোষ্ঠীর উপরে যে নির্মম অত্যাচার চালায় তা তিনি দেখেছিলেন।[৪] তৎসত্ত্বেও ১৯৪১ সালে জার্মানীর সাহায্য নেবার যে চেষ্টা সুভাষচন্দ্র করেছিলেন তার একটা সম্ভাব্য কারণ বোধহয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা লাভের ইচ্ছা তাঁর সবচেয়ে তীব্র থাকলেও এ ব্যাপারে তিনি সফল হতে পারেন নি। সেই অবস্থায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতিই হয়ত তাঁর কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল।

সুভাষচন্দ্র নাৎসি সরকারের সাহায্যে নিজের পরিকল্পনা রূপ দিতে গিয়ে বিশেষ বেগ পান। অপরদিকে তাঁকে নিয়ে নাৎসি সরকারও যথেষ্ট ঝামেলায় পড়ে। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্ভাবনা না থাকলে যেমন প্রাণ বিপন্ন করে তিনি ব্রিটিশ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ছেড়েছেন তেমনি করেই জার্মান গেস্টাপোকে ফাঁকি দিয়ে আবার জার্মানী ছাড়বেন—এই কথাও ঠাণ্ডা ভাষায় সুভাষচন্দ্রের জার্মান সরকারকে বলে দিতে হয়েছিল।[৫] কংগ্রেস বা ঐ রকম কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র সুভাষচন্দ্রের না থাকায় জার্মান সরকার তাঁর নাম ও রাজনীতিক ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সামরিক সহায়তা দান করতে চাইছিলেন না। তাঁরা কেবল সুভাষচন্দ্রকে রাজনীতিক আশ্রয় দানের কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের তা মোটেই মনঃপুত ছিল না। তবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্রকে পুরোপুরি হারাতেও জার্মানী তৈরী ছিল না, ফলে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবার আগে পর্যন্ত রেডিও প্রচার শুরু করার প্রস্তাবে দুপক্ষই রাজি হয়। সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল জার্মানী, অথবা অন্য কোন দেশের প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করা। তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মধ্য ইওরোপের দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 'স্বাধীন ভারত কেন্দ্র' (**Free India Centre**) গঠন করা। এই কেন্দ্র রেডিও প্রচার, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবে। তাঁর দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী (**Indian Legion**) গঠন করা। এ ছাড়া কর্মসূচীর মধ্যে ছিল স্বাধীন ভারতে কি কি ধরনের আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী হতে পারে তা অনুধাবন করার জন্য পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা।

এই সমস্ত কাজের জন্যে জার্মান সরকার ১৯৪১ সালে প্রতি মাসে কেন্দ্রকে

CENTRAL LIBRARY

১২০০ পাউণ্ড হিসেবে ধার দিতে শুরু করে যা ১৯৪৪ সালে বেড়ে প্রতি মাসে ৩২০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাতা ঠিক হয় মাসিক ৮০০ পাউণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে এই অর্থ সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিগত ধার হিসেবে জার্মান সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ করেন—এই দেনা শুধবার দায় ভারতবাসীর ছিল না। জার্মান সরকারের এই সমস্ত সাহায্য সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা তখনও তাদের কাছ থেকে আদায় করা যায় নি।

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাস থেকে স্বাধীন ভারত কেন্দ্র কাজ শুরু করে এবং ২ নভেম্বর কেন্দ্রের প্রথম সভা হয়। এই সভায় অনেকগুলো গুরত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল—১। জাতীয় অভিবাদন হিসেবে বিভিন্ন রকম ধর্মীয় ও আঞ্চলিক অভিবাদনের পরিবর্তে 'জয় হিন্দ্' প্রবর্তন করা, ২। জাতির নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্যে সুভাষচন্দ্র বসুকে 'নেতাজী' সম্বোধন করা, ৩। জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্'-এর পরিবর্তে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানের প্রবর্তন করা, ৪। জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দুস্থানীকে (হিন্দী+উর্দু) গ্রহণ করা এবং এর বর্ণমালা হিসেবে রোমান বর্ণমালা (A, B, C, D···) গ্রহণ করা।[৬]

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস থেকে 'আজাদ হিন্দ্ রেডিও' একটি নিজস্ব বেতার তরঙ্গে অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করে। প্রথমদিকে প্রতিদিন ৪৫ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। প্রত্যেকদিন অনুষ্ঠানে নেতাজীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া বেতার ভাষণ, যুদ্ধের খবর, রাজনীতিক পর্যালোচনা এবং দেশাত্মবোধক গান থাকত। আজাদ হিন্দ্ রেডিওর সাফল্যে এর প্রচার সময় বাড়িয়ে দৈনিক তিন ঘণ্টা করা হয়। এ ছাড়া 'কংগ্রেস রেডিও' এবং 'আজাদ মুসলিম রেডিও' নামে আরো দুটি বেতার কেন্দ্র অগস্ট আন্দোলনের সময় স্থাপন করা হয়। 'আজাদ হিন্দ্ রেডিও' থেকে প্রত্যেকদিন ইংরেজী, হিন্দী, পারসী, পুস্ত, তামিল, তেলেগু এবং একদিন অন্তর একদিন গুজরাটি ও মারাঠী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হত। বেতারের উপরে কোনো জার্মান নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এর এঞ্জিনীয়ারিং কর্মী ও টাইপিস্টরা ছাড়া আর সব কর্মীরাই ভারতীয় ছিল।[৭]

নেতাজী উত্তর আফ্রিকায় ধৃত ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় জওয়ানদের

CENTRAL LIBRARY

দ্রুত জার্মানীতে এনে তাঁর হাতে সমর্পণের প্রস্তাব দেন। সেই অনুযায়ী ড্রেসডেনের কাছে অ্যানাবার্গ ক্যাম্পে তাঁদের নিয়ে আসা হয়। তিন ব্যাটেলিয়ন পদাতিক এবং নাশকতামূলক কাজ ও গোয়েন্দা বিভাগের জন্যে আরো একটি কোম্পানি নিয়ে নেতাজী ভারতীয় বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেন। রাশিআর মধ্যে দিয়ে জার্মান বাহিনী তাজিক ও উজবেক বাহিনীর সহায়তায় মধ্য এশিআ পার হয়ে আফগান সীমান্তে পৌঁছলে ভারতীয় বাহিনী লড়াইয়ে অগ্রসর হবে এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর নৈতিক ভিত্তি টলিয়ে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে এটাই নেতাজীর মূল পরিকল্পনা ছিল।[৮] কেন্দ্রের অন্যতম নেতা এ, সি, এন নাম্বিয়ারের মতে তিনি ভারতীয়দের নিয়ে প্রবাসী সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজে প্রবাসী চেকোশ্লোভাক ও পোলিশ বাহিনীর উদাহরণ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[৯]

প্রথমে অ্যানাবার্গ বন্দী শিবিরের ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নিম্নপদস্থ অফিসারেরা ভারতীয় জাতীয় সেনাদল সম্পর্কে শত্রুভাবাপন্ন ছিল। নেতাজী যখন তাদের দেখতে প্রথম ঐ ক্যাম্পে যান তখন তাঁর বক্তব্যে বাধা দেবার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু ক্রমে তিনি সৈন্যদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। জার্মান সরকারের সঙ্গে খোলাখুলি বোঝাপড়া করে ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল গঠনের জন্যে নেতাজী নিম্নলিখিত শর্তগুলি আরোপ করেন—

১। জার্মান সামরিক বিভাগ বা **Wehrmacht** বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় জার্মান প্রশিক্ষকদের নেতাজীর অধীনে নিয়োগ করবেন।

২। জার্মান বাহিনীর প্রশিক্ষণের ধরন অনুযায়ী ভারতীয় বাহিনীকে পদাতিক বাহিনীর উপযুক্ত সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার ও মোটর চালিত ইউনিটের কাজ শেখাতে হবে। এই সঙ্গে তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ, নিয়মানুবর্তীতা, জাতীয় নীতিবোধ ও সহযোদ্ধাসুলভ মনোভাব গড়ে তোলা হবে।

৩। জার্মান স্থলবাহিনীর কোনো ইউনিটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও প্রশিক্ষণের জন্যে ভারতীয় বাহিনীকে কোনভাবেই জার্মান বাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা চলবে না।

৪। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ছাড়া ভারতীয় বাহিনীকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে লড়াই করতে পাঠানো চলবে না। অবশ্য আকস্মিকভাবে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে ভারতীয় বাহিনীর আত্মরক্ষার্থে লড়াইয়ের অধিকার থাকবে।

CENTRAL LIBRARY

৫। খাদ্য, বস্ত্র, ভাতা, ছুটি ও অন্য সমস্ত সুবিধে সুযোগের ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনী জার্মান সৈন্যদের সমান মর্যাদা পাবে।[১০]

বাহিনীর পতাকা হিসেবে গেরুয়া, সাদা, সবুজের মধ্যে উদ্যত ব্যাঘ্র, এই প্রতীক ব্যবহার করা হয়। বাহিনীর নাম দেওয়া হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। ১৯৪১ সালের ২৫ ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যোদ্ধারা বার্লিন থেকে ফ্রাঙ্কেনবার্গ-এ (স্যাক্সনী প্রদেশ) ফৌজের কেন্দ্রীয় দফতরে যাত্রা করে।[১১] ফৌজের গোপন দফতরের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয় এন, জি, স্বামীর নেতৃত্বে ব্রাণ্ডেনবার্গের মেসেরিৎজ নামক জায়গায়। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের প্রত্যেকবেই প্রথমে সমতার ভিত্তিতে দেখা হত। ব্রিটিশ বাহিনীর কোনো পদমর্যাদা (**rank**) গ্রাহ্য করা হত না। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এ প্রমাণিত যোগ্যতা ও কৃতিত্বই একমাত্র পদমর্যাদার মাপকাঠি বলে মনে করা হত। এর ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধবন্দী ভারতীয় নিম্নপদস্থ অফিসারদের মধ্যে অনেকে পদমর্যাদা হারাবার আশঙ্কায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদানে উৎসাহিত হননি।[১২]

ক্রমে বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকায় ফ্রাঙ্কেনবার্গের থেকে প্রশিক্ষণের জন্যে জওয়ানদের ড্রেসডেনের কাছে কোয়েনিগ্‌স্‌ব্রুয়েক-এ পাঠানো হয়। এই সময় নেতাজীর অনুকরণে ইটালীতে ইকবাল সেদাই নামে জনৈক ব্যক্তি **Centro Militare India** নামক বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন (এপ্রিল, ১৯৪২)। কিন্তু নেতৃত্বের ক্ষমতা, রাজনীতিক শক্তি ও কূটনীতিক জ্ঞানের অভাবে অচিরেই এই বাহিনী ভেঙে যায়।[১৩] অপরদিকে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর-এ ফৌজের চারটি ব্যাটেলিয়ন গঠন করা হয়। নেতাজী হিন্দুস্থানী ভাষায় সৈনিক ব্যারাকগুলিতে বক্তৃতা দিতেন, ঐ জওয়ানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন ও মাঝে মাঝেই আকস্মিকভাবে তাদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন করতেন। ব্রিটিশ বাহিনীতে শিখ, গোর্খা, গাড়োয়ালি, রাজপুত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যে ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির ভিত্তিতে পৃথক রেজিমেণ্ট তৈরি করা হত। আজাদ হিন্দ্ ফৌজে প্রকৃত জাতীয় মনোভাব বিকাশের উদ্দেশ্যে শিখ, মুসলমান, রাজপুত, জাঠ, গাড়োয়ালি অথবা মারাঠা সবাইকে নিয়েই মিশ্রিত বাহিনী তৈরি করা হত। নেতাজীর ইচ্ছাক্রমে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে

CENTRAL LIBRARY

কুড়িজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভারতীয়দের নিয়ে একটি নিরাপত্তা পুলিসবাহিনী তৈরি করা হয়।

ভারতবর্ষের বিশাল তটরেখায় আক্রমণ চালানো ও স্বাধীন ভারতে তটরক্ষী বাহিনীর গুরুত্ব নেতাজীর কাছে অত্যন্ত বেশী বলে মনে হয় এবং তিনি আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সমুদ্র-সমতলের যুদ্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু জার্মানীতে এর সুযোগ কম থাকায় তাঁদের হল্যাণ্ডে সমুদ্র উপকূলে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে ফৌজের মধ্যে নানা রকমের অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ফৌজের কিছু তরুণ জওয়ান ও অফিসার সামরিক ক্যাম্পের কড়া জীবনযাপনের পরিবর্তে সুখী নাগরিক জীবনের প্রলোভনে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই ঐ এলাকার জার্মান তরুণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন এবং বিবাহিত শান্ত জীবন যাপনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত, কোয়েনিগ্‌স্‌ব্রয়েক শহর বসবাসের পক্ষেও আরামদায়ক ছিল এবং নাগরিকদের সঙ্গে ফৌজী জওয়ানদের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়ত, ফৌজের মধ্যে জার্মান প্রশিক্ষকদের সঙ্গে এই সময় কোনো কোনো সৈনিকের বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ঐ সৈনিকেরা নিজেদের স্বার্থে ফৌজের বিরুদ্ধে বাহিনীর অন্যান্য জওয়ানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এই সময় নেতাজী পূর্ব এশিআয় চলে গিয়ে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা ও বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এই বিক্ষোভ গড়ে ওঠার সুযোগ পায় এবং নেতাজী পূর্ব এশিআয় রওনা হওয়ার পরে তা সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খলার চেহারা নেয়। অবশ্য ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ হল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করে। ১৯৪২ সালের শেষদিকে ফৌজের সৈন্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ৩৫০০, এবং এই সময় ফৌজে আর লোক নেওয়া স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৪]

১৯৪২ সালের প্রথম থেকেই নেতাজী আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে ভারতে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্যে কংগ্রেসের কাছে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। অপর প্রবাসী বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুও টোকিও বেতার থেকে একই প্রচার চালাচ্ছিলেন। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা ত্বরান্বিত করার জন্যে নেতাজী ত্রি-পাক্ষিক জোটের ওপরে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এ ব্যাপারে জাপান সর্বপ্রথম সম্মত হয় এবং পূর্ব এশিআর ইণ্ডিআন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স

CENTRAL LIBRARY

লীগ, ভারতের জাতীয় বাহিনী (I. N. A.) এবং তাদের নেতা রাসবিহারী বসুর অনুরোধক্রমে নেতাজীকে পূর্ব-এশিআয় কাজ শুরু করার আমন্ত্রণ জানায়। ২৯ এপ্রিল ওবারসাল্‌জবুর্গ-এ হিটলার এবং মুসোলিনী শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু তখনও তাঁরা এই ধরনের ঘোষণায় সম্মত ছিলেন না। ৫ মে নেতাজী মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসোলিনী তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। তিনি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার প্রস্তাব জানিয়ে হিটলারের উদ্দেশ্যে তারবার্তা প্রেরণ করেন। অপরদিকে নেতাজী নিজেও ২৯ মে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু হিটলার তখনও পর্যন্ত এই ধরনের ঘোষণা করবার মত পরিণত পরিবেশ তৈরি হয়নি বলে মন্তব্য করেন। এর ফলে সামরিক বাহিনী ও স্বাধীন ভারত কেন্দ্রের কাজকর্ম যথেষ্ট ভালভাবে চলা সত্ত্বেও এবং এই সংগঠনগুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও নেতাজী জার্মানীতে থাকার কার্যকারিতা সম্পর্কে আশা হারিয়ে ফেলেন।[১৫]

জার্মানীতে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত ওশিমা এবং তাঁর মিলিটারী এ্যাটাশে কর্নেল ইয়ামামোতোর চেষ্টায় নেতাজী জাপানী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন। একই সময় তিনি ইটালীর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে অবতরণের বিকল্প পরিকল্পনা করেন, কিন্তু অসুবিধাজনক হওয়ায় এই পরিকল্পনা পরে ত্যাগ করা হয়। অবশেষে, জার্মান ও জাপান সরকারের সহায়তায় নেতাজী ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুআরি একমাত্র সঙ্গী আবিদ হাসানকে নিয়ে বার্লিন থেকে কিয়েল বন্দরে যান। সেখানে অত্যন্ত গোপনে পরের দিন তিনি একটি জার্মান সাবমেরিনে চড়েন। প্রথমে নেতাজী তাঁর সঙ্গে আবিদ হাসান ও স্বামী এই দুজনকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। শেষ মুহূর্তে স্থানাভাবে স্বামীকে নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। তাঁরা প্রায় সাড়ে তিন মাস জার্মান ইউ-বোটে চূড়ান্ত বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে মাডাগাস্কার-এর কাছে পৌঁছন। এইখানে আগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ২৮ এপ্রিল নেতাজী ও তাঁর সঙ্গীকে জাপানী সাবমেরিন 'আই-২৯'এ স্থানান্তরিত করা হয়। সুমাত্রার অন্তর্গত সাবাঙ-এ তাঁরা সাবমেরিন ত্যাগ করেন এবং কর্নেল ইয়ামামোতোর তত্ত্বাবধানে বিমানপথে ১৩ জুন টোকিও পৌঁছন। এইভাবে দীর্ঘ সাড়ে চার মাস ব্যাপী ঐতিহাসিক যাত্রার অবসান হয়।[১৬]

CENTRAL LIBRARY

দক্ষিণ-পূর্ব এশিআয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

টোকিও থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌছন ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই। ৪ জুলাই ক্যাথে সিনেমাগৃহে রাসবিহারী বসু একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রোতৃবৃন্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এর পরে তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নেতাজীর হাতে ইণ্ডিআন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

কিন্তু পূর্ব এশিআয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সূত্রপাত নেতাজী আসবার আগেই হয়েছিল। মালয় অঞ্চলে যুদ্ধ করবার জন্যে ৬০,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে সমাবেশ করা হয়েছিল। মালয় যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হয়, ১৯৪২-এর ১৫ ফেব্রুআরি জাপানীদের হাতে ইঙ্গ-আমেরিকান ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা রাসবিহারী বসু তিন দশকের বেশী সময় জাপানে বাস করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে জাপ বিজয়ের সুযোগ নেবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। জাপানী ব্ল্যাক ড্রাগন দলের নেতা অধ্যাপক তোয়ামা এবং সামরিক বিভাগের মেজর ফুজিওআরাকে তিনি এ সম্পর্কে স্বমতে আনার চেষ্টা করতে থাকেন। ভারতীয় বাহিনীর ক্যাপ্টেন মোহন সিংও জাপানী সরকারকে একই অনুরোধ জানান। ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে কর্ণেল হাণ্ট ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সৈন্যদের মেজর ফুজিওআরার হাতে সমর্পণ করেন। মেজর ফুজিওআরা ১৯৪২ সালের ১৬ ফেব্রুআরি এই সমস্ত সৈন্যদের আবার ব্রিটিশ-ভারতীয় বাহিনীর ১/১৪তম পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর হাতে দায়িত্ব তুলে দেন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং এই ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে ঐখানেই সর্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল গঠন করেন। সিঙ্গাপুর, মালয়, হংকং, জাভা, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলের ভারতবাসীরা এর পরে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দুটি সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (**Indian Independence League**) গঠন করেন। ভারতীয় সৈন্যদলের পরিচালনার দায়িত্ব লীগের হাতে অর্পণ করা হয়। এরপরে জার্মানীতে নেতাজীকে পূর্ব-এশিআয় পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে

CENTRAL LIBRARY

তারবার্তা প্রেরণ করা হয়। ১৯৪২ সালের ১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে **Indian National Army** বা I. N. A.-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ৪৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য ও অফিসার এই বাহিনীতে যোগ দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রাসবিহারী বসু মোহন সিংকে জেনারেল পদে উন্নীত করেন।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই জেনারেল মোহন সিং, কে, পি, কে মেনন, জি. কিউ, গিলানীর অসহযোগিতা এবং রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁদের প্রবল মতবিরোধ হওয়ায় তাঁরা কার্যকরী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। রাসবিহারী বসু প্রাণপণ চেষ্টা করে সৈন্যবাহিনীকে কেবল টিঁকিয়ে রাখতে সমর্থ হন।[১৭]

এর পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপরে দায়িত্ব পড়ে বিবদমান, বিশৃঙ্খল এবং অকেজো আই, এন, এ এবং লীগকে পুনর্গঠিত করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবার। ১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই লীগের কার্যভার গ্রহণের পরের দিন নেতাজী প্রথম আই, এন, এ সৈনিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তাঁর প্রতি প্রদর্শিত সামরিক সম্মানের প্রত্যুত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে স্পষ্টভাবে আই, এন, এ-র দায়িত্ব, কর্তব্য এবং কর্মপদ্ধতি তুলে ধরেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি সৈন্যদের কাছে 'চলো দিল্লী' ধ্বনি উপস্থিত করেন।

৬ জুলাই জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো নেতাজীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পরিদর্শনে আসেন। এখানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও বেসামরিক জনতার সামনে তিনি জাপান সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। এগুলি হল—১। ভারতসম্পর্কে জাপানের কোন ভূখণ্ডগত, সামরিক বা আর্থনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা (ambition) নেই, ২। যে কোন বিদেশী শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে, ৩। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান সবরকম সাহায্য দান করবে।[১৮] পূর্ব এশিআয় নেতাজী এইদিন থেকে 'জয়হিন্দ্' সম্বোধন চালু করার জন্যে সকলকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিদেশের মাটি থেকে সহায়তা করার দুটি প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমত, এর ফলে ভারতের সংগ্রামরত জনতা বুঝতে পারবে যে ভিতর এবং বাইরে থেকে সম্মিলিত আক্রমণে ব্রিটিশ আধিপত্য চূর্ণ হবেই—জনগণের মনোবল এবং নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের

CENTRAL LIBRARY

স্বাধীনতা লাভের জন্যে বাইরে থেকে সামরিক সাহায্য লাভ একান্ত অপরিহার্য—আই. এন. এ সে অভাব পূর্ণ করবে (৯ জুলাই-এর ভাষণ)। ঐ বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেন যে আই, এন, এ, ভারতের মাটিতে পৌঁছতে পারলেই সংগ্রামরত জনগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে সমর্থ হবে। এর ফলে ভারতে বিপ্লব শুরু হবে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে দেখা দেবে ব্যাপক বিদ্রোহ এবং এই গণবিপ্লবেই ব্রিটিশ রাজত্ব ধ্বংস হবে—তার জন্যে জাপানের উপরে নির্ভর করতে হবে না। নেতাজীর বিখ্যাত স্লোগান **'Total Mobilisation for a Total War'** (সার্বিক যুদ্ধের জন্যে চাই সর্বস্ব দান—ভাবার্থে) এই বক্তৃতাতেই প্রথম শোনা যায়। একটি নারী বাহিনী গঠনের কথা এখানেই তিনি প্রথম ঘোষণা করেন। তিনি আই, এন, এ-র জন্যে তিন লক্ষ সৈনিক এবং সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে তিন কোটি ডলার দান করার আহ্বান জানান। সিঙ্গাপুরের এই সভায় ৬০ হাজার ভারতীয় ছাড়াও বহু মালয়ী এবং চীনা উপস্থিত ছিলেন।[১৯]

এর পরে নেতাজী ইণ্ডিআন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পুনর্গঠনে হাত দেন। লীগের কাজ ১৩টি বিভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একজনকে এক এক বিভাগের প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বিভাগগুলি হল—১। সাধারণ, ২। প্রচার ও জনসংযোগ, ৩। অর্থ, ৪। শিক্ষা, ৫। সমাজকল্যাণ, ৬। বাসস্থান ও যানবাহন, ৭। নারী, ৮। সরবরাহ, ৯। কর্মী সংগ্রহ, ১০। গোয়েন্দা, ১১। প্রশিক্ষণ, ১২। পুনর্গঠন, ১৩। সিংহল। লীগের বিভাগ থেকে বোঝা যায় যে এর কাজকর্ম ছিল প্রায় একটি সরকারের মতই, যদিও লীগের সরকারের মর্যাদা ছিল না, তবুও জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিআর সমস্ত জাতীয় সরকারই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। লীগের সদর দপ্তরে কর্মীদের ১৪টি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল যার সঙ্গে ফৌজের স্তরবিন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই স্তর বিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মী ভাতা পেতেন।[২০]

১৯৪৩ সালের ২৫ অগস্ট নেতাজী আনুষ্ঠানিক ভাবে আই, এন, এ-র সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার নেন এবং আই, এন, এ-র নাম রাখেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'—যেমন জার্মানীতে তিনি করেছিলেন। নেতাজী ফৌজের পূর্বতন গঠন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি আগেকার সামরিক ব্যুরো তুলে দেন। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) জে, কে, ভোঁসলেকে

CENTRAL LIBRARY

'চীফ অব স্টাফ' নিয়োগ করেন। এ ছাড়া সদর দপ্তরে চারজন এ, ডি, সি, হিসেবে যথাক্রমে ক্যাপ্টেন বি, এস, রাওয়াত, ক্যাপ্টেন শমশের সিং, ক্যাপ্টেন কুলবীর থাপা ও ক্যাপ্টেন রিজভিকে নিয়োগ করেন। নতুন যে শাখাগুলি তৈরি করা হয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) শাহনওয়াজ খানের অধীনে সামরিক পরিকল্পনা, আক্রমণ, প্রশিক্ষণ এবং গোয়েন্দা বিভাগ ('জি')। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এন, এস, ভগতের অধীনে সাধারণ (সামরিক) প্রশাসন বিভাগ ('এ')। লেঃ কর্ণেল (পরে কর্নেল) কে, পি, থিমাইয়ার অধীনে সামরিক সরবরাহ ও পরিবহণ বিভাগ ('কিউ')। লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) এ, ডি, লোগনাথনের অধীনে চিকিৎসা বিভাগ এবং লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরের অধীনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ।

এ ছাড়া লেঃ কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) মহম্মদ জামান কিয়ানী-র অধীনে প্রথম ডিভিশন গঠন করা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি গেরিলা রেজিমেণ্ট। এগুলির নাম গান্ধী রেজিমেণ্ট, আজাদ রেজিমেণ্ট এবং নেহেরু রেজিমেণ্ট। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মোট তিনটি ডিভিশন ছিল, প্রতিটি ডিভিশনে দশহাজার সৈনিক ছিলেন। এছাড়া নেতাজী দায়িত্ব নেবার পরে অনেক বেশী বে-সামরিক ভারতীয়ও ফৌজে যোগ দেবার আবেদন জানান। এই সামরিক শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ২০,০০০। পূর্ব এশিআতে নেতাজী জার্মানীর মতই যে কোনো সময়ে বিনা অথবা স্বল্পকালীন ঘোষণায় যে কোনো ফৌজী ছাউনি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাজির হতেন, খুঁটিয়ে সব কিছু নিজের ইচ্ছেমত পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সৈনিকদের সঙ্গে খুব ঘরোয়াভাবে মেলামেশা করতেন।[২১]

লীগ পুনর্গঠন করার ফলে মালয়, সিঙ্গাপুর, বর্মা, জাভা, সিয়াম, সুমাত্রা, সায়গন, হংকং, সাংহাই, জাপান প্রভৃতি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নবোদ্যমে কাজ শুরু হয়। সর্বস্ব ত্যাগের আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায়। এক এক জায়গায় কয়েক সেণ্ট (পয়সা জাতীয়) থেকে শুরু করে বহু লক্ষ ডলার পর্যন্ত সংগৃহীত হয়। নেতাজীর গলার মালা পাঁচলক্ষ ডলারে নিলামে ক্রয় করা, যথা সর্বস্ব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করে দেওয়া প্রভৃতি ধরনের কাজের প্রতিযোগিতায় যেন প্রবাসী ভারতীয়রা নেমে পড়েন। এছাড়া জাতীয় শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় চালানো এবং গৃহহীন ভারতীয়দের জন্যে

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও যোগ্যতার সঙ্গে করা হতে থাকে।[২২] মালয়, বর্মা এবং সিয়াম (থাইল্যাণ্ড)-এর মোট ভারতীয় জনসংখ্যা ১৪,৫৫,০০০ হলেও[২৩] এই সময়ে ফৌজের আরও বৃদ্ধিতে অসুবিধে দেখা দেয়। জাপানী সরকার কোনভাবেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে ত্রিশ হাজার সৈন্যের জন্যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রের চেয়ে বেশী অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজী ছিল না। ফলে নেতাজীর তিনলক্ষ সৈন্য সংগ্রহের পরিকল্পনা কখনও বাস্তবে রূপ নেয়নি।[২৪]

ঝান্সি রাণী বাহিনী

যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রাণ ও সেবার কাজে মেয়েরা আগে থেকেই নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও মেয়েদের ভূমিকা কম ছিল না; যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা নেপথ্য থেকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু নেতাজীর লক্ষ্য ছিল মেয়েদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা, যে বাহিনী সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষা নিয়ে লড়াইয়ের মূল ময়দানেও অবতীর্ণ হতে পারবে। এর ফলে মেয়েদের ভীরুতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতি দূর হবে এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ বাড়বে।

এই উদ্দেশ্যে নেতাজী ১৯৪৩ সালে ২২ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ঝান্সির রাণী বাহিনীর প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। সিঙ্গাপুরে বাহিনীতে ৫০০ জন মহিলা ছিলেন যাঁরা মালয়ালি, তামিল, তেলুগু, বাঙালী, গুর্খা, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মেয়েদের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ দেখা দেওয়ায় এর পরে ব্যাংকক এবং রেঙ্গুনে দুটো শিক্ষাশিবির খোলা হয়। লেঃ কর্নেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সেহগল) ঝান্সি রাণী বাহিনীর অধিনায়িকা ছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সুদীর্ঘ পশ্চাদপসরণের সময় এঁরা অনেকেই লড়াইয়ে অংশ নেন এবং শহীদ হন।[২৫]

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার

আমরা আগে দেখেছি যে জাপানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জার্মানী এবং ইতালী ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণা করতে রাজি না হওয়ায় নেতাজী ইওরোপে আজাদ্ ফৌজের সম্প্রসারণ ঘটাতে সম্মত হননি বরং পূর্ব এশিআয় চলে আসেন। পূর্ব এশিআতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কাজ এর আগে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অচলাবস্থায় এসে পৌঁছনো এবং আই, এন, এ-র

CENTRAL LIBRARY

আগেকার বিশৃঙ্খলার মূল কারণ ছিল ভারতীয় অস্থায়ী সরকারের অভাব। এর অবর্তমানে এখানকার ফৌজ ও লীগের নেতাদের জাপান, বর্মা প্রভৃতি রাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অস্বস্তিকর ও অনিয়ন্ত্রিত। তাঁরা ঐ সব সরকারের মন্ত্রীদের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন না, ফলে তাঁদের নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট অসুবিধে হত। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রাপ্ত অস্থায়ী ভারত সরকারই কেবল প্রবাসী ভারতীয়দের পূর্ণ আনুগত্য দাবী করার বৈধ অধিকারসম্পন্ন ছিল।

আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্যন্ত নেতাজীকেও এ ধরনের অসুবিধের সামনে পড়তে হয়েছে। যেমন জাপ বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিআর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট তেরাউচি প্রথম থেকেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকতে দেবার বিপক্ষে ছিলেন। ফৌজ মাত্র গোয়েন্দাগিরি এবং প্রচারের কাজ করবে—এটাই তাঁর বক্তব্য ছিল। এর ফলে নেতাজীকে বলতে হয়েছিল যে, "জাপান আত্মোৎসর্গ করে যদি ভারতকে স্বাধীন করে তবে সে স্বাধীনতার থেকে পরাধীনতাও ভাল।"[২৬] আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এ সম্পর্কে জাপানী কর্তৃপক্ষকে স্বমতে আনতে নেতাজীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় এবং জাপানী সংযোগ দপ্তর হিকারি কিকান ও তার অধিকর্তা ইয়ামামোতোর সঙ্গে এর ফলে যথেষ্ট তিক্ততাও সৃষ্টি হয়।[২৭]

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ক্যাথে সিনেমাগৃহে একটি বর্ণাঢ্য সম্মেলনে 'আরজি-হুকুমত-ই আজাদ হিন্দ্' বা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিন পূর্ব এশিআর ছয়টি দেশ থেকে লীগ প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের প্রথমে লীগের সাধারণ সম্পাদক লেঃ কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) এ, সি, চ্যাটার্জী লীগের বিগত সময়ের কাজের বিবরণী পেশ করেন। এরপর নেতাজী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ও মন্ত্রী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং আজাদ হিন্দ্ সরকারের ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন। নিচে মন্ত্রিসভার পুরো বিবরণ দেওয়া হল :—

১। সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ দফ্তর ও বিদেশ মন্ত্রী, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

২। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী সংগঠন।

৩। এস, এ, আয়ার—প্রচার ও জনসংযোগ।

৪। লেঃ কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী—অর্থ।

৫। „ আজিজ আমেদ খান	মন্ত্রিসভায় সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি
৬। „ এন. এস. ভগত	
৭। „ জে কে ভোঁসলে	
৮। „ গুলজারা সিং	
৯। „ মহম্মদ জামান কিয়ানী	
১০। „ এ. ডি. লোগনাথন	
১১। „ ইশান কাদির	
১২। „ শাহ্‌নওয়াজ খান	

১৩। এ. এম. সহায়—মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন সচিব।

১৪। রাসবিহারী বসু—সর্বোচ্চ উপদেষ্টা

১৫। করিম গণি	উপদেষ্টা
১৬। দেবনাথ দাস	
১৭। ডি. এম. খান	
১৮। জে. থিবি	
১৯। ঈশ্বর সিং	
২০। এ. ইযেলাপ্পা	

২১। এ. এন. সরকার—আইন উপদেষ্টা।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ও দফ্‌তর ঘোষণার পরে নেতাজী আজাদ সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রে সংক্ষেপে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র ও ধারাবাহিকতা বর্ণনা করে চূড়ান্ত সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে এই সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ এবং তার সহযোগী শক্তিগুলির উৎখাত করা এর প্রথম কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সরকারের দ্বিতীয় কর্তব্য হবে স্থায়ী এবং স্বাধীন জাতীয় ভারত সরকার দেশবাসীর ইচ্ছানুযায়ী এবং তাদের পূর্ণ আস্থার ভিত্তিতে গঠন করা। যতদিন না এই স্থায়ী সরকার স্বাধীন ভারতে গঠিত হবে ততদিন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্‌ সরকারই ভারতের শাসন কাজ পরিচালনা করবে। এই সরকার সমস্ত ভারতবাসীর আনুগত্য লাভ করার যোগ্য এবং সেই আনুগত্য দাবী করে—একথা ঘোষণায় বলা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার এবং সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ

CENTRAL LIBRARY

সুবিধার কথাও ঘোষণা করা হয়। সমগ্র জাতি এবং তার প্রতিটি অংশের সুখ সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং দেশবাসীর উপরে বিদেশী সরকার কর্তৃক আরোপিত বিভেদগুলি অতিক্রম করবার দৃঢ় অঙ্গীকার নেওয়া হয়।[২৮]

এই অনুষ্ঠানে নেতাজী ও অন্য মন্ত্রীরা শপথ নেন। ঐ রাত্রেই মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক হয়। নিম্নলিখিত দেশের সরকারগুলি আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়—১। জার্মানী, ২। ক্রোশিয়া, ৩। চীন (নান্‌কিং সরকার), ৪। মাঞ্চুকুয়ো, ৫। ফিলিপাইন্‌স্, ৬। বার্মা, ৭। ইটালী, ৮। জাপান এবং ৯। সিয়াম। এ ছাড়া আইরিশ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ইমন ডি ভ্যালেরা নেতাজীকে এই উপলক্ষে ব্যক্তিগত অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করেন।[২৯] কিন্তু ফ্রান্সের ভিশি সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতিদানকারী কোনো বার্তা না পেয়ে নেতাজী হতাশ হন।[৩০]

২২ অক্টোবর (ঝাঁসির রাণী বাহিনী প্রতিষ্ঠা দিবসে) রাত্রে নেতাজীর বাসভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠন হয় এবং মধ্যরাত্রে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুর বেতার থেকে ব্রিটিশ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিঅন মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিআর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

প্রথমে আজাদ হিন্দ্ সরকারের চারটি প্রধান বিভাগ তৈরি করা হয়। এগুলি হল—১। অর্থ, ২। প্রচার ও জনসংযোগ, ৩। নারী, ৪। যুদ্ধ। এ ছাড়া মন্ত্রিসভার কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সুপারিশ ও পরামর্শ দেবার জন্যে কয়েকটি উপসমিতির গঠন করা হয়। যেমন—১। জাতীয় পরিকল্পনা উপ-সমিতি—এরকম কমিটি নেতাজী জার্মানীতেও গঠন করেছিলেন। এই উপসমিতি ভারতবাসীর জন্যে সাধারণ পোশাক, সাধারণ সম্বোধন ও সাধারণ সম্মান প্রদর্শন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দান করত।

২। সামরিক ও বেসামরিক খেতাব ও সম্মান সংক্রান্ত উপসমিতি—শহীদ-ই-ভারত, শের-ই-হিন্দ্, সর্দার-ই-জঙ্গ, বীর-ই-হিন্দ্, তংঘা-ই-বাহাদুরি, (দুই শ্রেণীর), তংঘা-ই-শত্রুনাশ, সেবক-ই-ভারত ইত্যাদি ছিল আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রদত্ত খেতাব ও সম্মান।

৩। বেতন, ভাতা এবং অবসরকালীন ভাতা সংক্রান্ত উপসমিতি। এ. সি. চ্যাটার্জীর পরামর্শক্রমে পুনর্গঠন বিভাগের তত্ত্বাবধানে বেসামরিক অফিসারদের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হয়।

CENTRAL LIBRARY

মুক্তাঞ্চলে প্রশাসন চালাবার সুবিধের জন্যে আগে থাকতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে বহু বিতর্কিত জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীত সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়। পতাকা থাকে চরকা-বিহীন ত্রিবর্ণ—গেরুয়া, সাদা, সবুজ। জাতীয় সংগীত নতুন করে রচনা করতে হয়। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির সুর এবং কথার সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতি রেখে 'সুভ সুখ চয়ন কি বরখা বরসে' গানটি রচনা এবং সুরারোপ করেন হুসেন। এই গৌরবময় কাজের জন্যে তাঁকে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজী দশ হাজার ডলার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।[৩১]

অক্টোবর মাস থেকে সমস্ত কাজের জন্যে আরো বেশী অর্থ সংগ্রহ দরকার হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা অফিসার হিউ টয়ের লেখায় পাওয়া যায় যে এইসময়ে অর্থসংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে এবং নেতাজীকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের টাকা দেবার জন্যে জেলের ভয় দেখাতে হয় এবং স্বেচ্ছায় না দিলে যে জোর করে অর্থ আদায় করা হবে এ কথাও নাকি তিনি বলেন।[৩২] কিন্তু বিপরীত চিত্রও অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন, গুজরাটি গোঁড়া চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের মন্দিরে নেতাজীকে সেই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দান গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানানো হলে নেতাজী জানান যে তাঁর সমস্ত ধর্মের এবং বর্ণের সহকর্মীকে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিলে তবে তিনি এই দান নিতে যেতে পারেন। চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের মতো গোঁড়া সম্প্রদায়ের কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো বলপ্রয়োগ করা হবে না এ কথা স্পষ্ট জানানো সত্ত্বেও তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে সবাইকেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মন্দিরে একেবারে বিগ্রহের সামনে আমন্ত্রণ করেন এবং সেদিন থেকে সবার জন্যে মন্দির খুলে দেন।[৩৩] আজাদ হিন্দ্ সরকার অর্থ সংগ্রহের জন্যে বোর্ড অব ম্যানেজমেণ্ট গঠন করে। ১৯৪৪ সালের প্রথম থেকে বোর্ডের কাছে ভারতীয়দের নিজেদের আয় ও সম্পদের পরিমাণ ঘোষণা করতে হত এবং এর ভিত্তিতে দশ থেকে পঁচিশ শতাংশ লেভি তাঁদের উপরে ধার্য করা হত।[৩৪] আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যুদ্ধে যাত্রা করার পরে প্রবাসী ভারতীয়রা যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দানের জন্যে আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বার্মায়। হাবিব সাহেব এক কোটি তিন লাখ টাকা মূল্যের তাঁর যাবতীয় সম্পত্তিই শুধু আজাদ হিন্দের 'নেতাজী ফাণ্ড কমিটি'-তে দান করেন নি, নিজেকেও উৎসর্গ করেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিক হিসেবে। একই রকম ভাবে নাম করা যায় বি. ঘোষ, শ্রীমতী বেতাই,

CENTRAL LIBRARY

নিজামী, বশির আমেদ প্রমুখের যাঁরা সর্বস্ব দান করেছিলেন।[৩৫] এই উদাহরণ গুলো দেবার অর্থ হল এই যে বিপ্লবী এবং স্বীকৃত সরকার হিসেবে ভারতীয়দের সম্পত্তির উপরে পূর্ণ অধিকার থাকলেও, খুব কম জায়গাতেই আজাদ হিন্দ্ সরকারের বলপূর্বক সেই অধিকার প্রয়োগ করার দরকার হয়েছে। নেতাজী প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে যে তিন কোটি ডলার চান তার দ্বিগুণেরও বেশী তাঁরা দিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে জাপান সরকারের আমন্ত্রণে টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিআ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এথানে দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব এশিআর বিভিন্ন সরকারের প্রধানদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রধান নেতাজীকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আজাদ হিন্দ্ সরকার বা ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারত কূটনীতিক ভাবে যাতে কোনো ফাঁদে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য নেতাজী ঘোষণা করেন যে তিনি কেবল পর্যবেক্ষক হিসেবে এই সম্মেলনে যোগ দেবেন, প্রতিনিধি হিসেবে নয়। দ্বিতীয়ত, জাপান সরকারকে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে তিনি বর্তমান অবস্থায় তাঁর দেশের পক্ষ থেকে কোন ধরনের প্রতিশ্রুতি (**Commitment**) দেবেন না।[৩৬] আরো বহু ঘটনার মত এই ঘটনাও গভীর রাজনীতিক তাৎপর্য বহন করে কারণ বিদেশী প্রভাবমুক্ত থেকে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে নেতাজী যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন তা এর থেকে বোঝা যায়। এই সম্মেলনে জাপানী প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁর বক্তৃতায় স্বাধীন ভারতে নেতাজীই সব ক্ষমতার অধিকারী হবেন—এ ধরনের কথা বলায় নেতাজী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে স্বাধীন ভারতের সর্বেসর্বা কে হবে না হবে সেটা ভারতের জনগণই কেবল নির্ধারণ করবে, এটা তোজোর করে ঠিক দেবার ব্যাপার নয়।[৩৭]

এই সময়ে নেতাজী রাজনীতিক এবং সামরিক দিক থেকে আরো কয়েকটি সাফল্য লাভ করেন। তিনি তেরাউচি কর্তৃক আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে লড়তে না দেবার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন এবং ফৌজের লড়াই করবার, পুরো তিন ডিভিশন সৈন্যের জন্যে অস্ত্র সরবরাহ করবার এবং আরো নানা ব্যাপারে জাপান সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল দুটি ব্যাপার—জাপান কর্তৃক অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ্ সরকারের হাতে সমর্পণ করা এবং যুদ্ধরত জাপানী ও আজাদী ফৌজ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করলে ঐ অঞ্চলসমূহ জাপানী অধিকারে

CENTRAL LIBRARY

না গিয়ে আজাদ হিন্দ্ সরকারের অধিকারে আসবে—এ ব্যাপারে রাজী করানো।[৩৮] জাপানী স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুগিয়ামার সঙ্গে নেতাজীর এই মর্মে চুক্তি হয় যে ১৯৪৪ সালের পরিকল্পিত আক্রমণে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী জাপানী অপারেশনাল কমাণ্ডের নেতৃত্বে সহযোগী বাহিনী হিসেবে লড়াই করবে।

নভেম্বর মাসে নেতাজী আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনে যান। তিনি দ্বীপগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষে গ্রহণ করেন এবং বেসামরিক প্রশাসন চালাবার জন্য লেঃ কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) এ. ডি. লোগনাথনকে দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেন। সহকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয় মেজর আলওয়াইকে। নেতাজী দ্বীপদুটির নতুন নামকরণ করেন। আন্দামানের নাম হয় শহীদ দ্বীপ, এবং নিকোবরের নাম হয় স্বরাজ দ্বীপ। কুখ্যাত সেলুলার জেলের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। আজাদ হিন্দ্ সরকারের চীফ কমিশনার দ্বীপপুঞ্জে নিম্নলিখিত বিভাগ-গুলির কাজ শুরু করে দেন— ১। শিক্ষা, ২। খাদ্যোৎপাদন, ৩। হস্তশিল্প, ৪। প্রচার ও জনসংযোগ, ৫। বেসামরিক বিচার ব্যবস্থা ৬। নারী বিভাগ।[৩৯]

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আসন্ন যুদ্ধের কাজে বেশী সহায়তা করার জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে আজাদ হিন্দ্ সরকার এবং লীগের সদর দফ্তর বার্মার রেঙ্গুনে এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। ফৌজের চতুর্থ গেরিলা রেজিমেণ্ট সুভাষ ব্রিগেড এবং লেঃ কর্ণেল জামান কিয়ানীর নেতৃত্বে প্রথম ডিভিশন বার্মায় রওনা হয়। 'সুভাষ ব্রিগেড' নামটি নেতাজী পছন্দ না করায় পরে এটিকে শুধু 'প্রথম রেজিমেণ্ট' বলা হত। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সুব্যবহারের ফলে বার্মায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সম্পর্কে বর্মী জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আস্থাসূচক মনোভাব তৈরি হয়। এ ছাড়া নেতাজীর সভায় তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যেও প্রচুর সাধারণ বর্মী মানুষের সমাগম হত। এর আগে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে নেতাজী বর্মার রাষ্ট্র-প্রধান ডঃ বা ম-র হাতে বর্মী জনগণের কল্যাণের জন্যে পাঁচলক্ষ টাকা দান করেন।[৪০] শুধুমাত্র গ্রহীতা না থেকে সমান মর্যাদালাভের অন্যতম পথ হিসেবে তিনি আগে জাপান সরকারকেও ভারতবাসীর পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে দশটি সামরিক বিমান কেনার অর্থ দান করেন।[৪১]

নেতাজী ১৯৪৪ সালের জানুআরি মাসে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক

CENTRAL LIBRARY

কাজগুলির জন্যে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি ঝাঁসি রাণীবাহিনীর প্রচুর নারী এই 'সুইসাইড স্কোয়াড'-এ যোগ দিতে চান। এই স্কোয়াডের স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকারা শত্রুর ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া, নেতাজীর আগ্রহে ছয় থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'বাল-সেনা' বাহিনী তৈরি হয়। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবেই প্রধানত এদের তৈরি করা হত।[৪২]

যুদ্ধ শুরু করার ঠিক আগে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং সরকারকে বিভিন্ন রকম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জাপান সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিআর নানা জায়গায় ভারতীয়দের সংগ্রহ করে জাপ বাহিনীর সঙ্গে আরাকান ফ্রন্টে পাঠাবার চেষ্টা করে। আজাদ হিন্দ্ সরকারের এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং তাঁদের কিছুই না জানিয়ে এই ধরনের কাজ করা হয়। এই জাপ ভারতীয় বাহিনীকে 'জে' বাহিনী বলা হত। আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ থেকে জাপান সরকারের কাছে ভারতীয়দের ব্যবহার করার এ ধরনের চেষ্টার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ করা হয়। এছাড়া ফৌজের নিজস্ব কামান বাহিনী, মর্টার প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এমন কি অন্যান্য সরঞ্জামও খুব কম ছিল। সামরিক বুটের অভাবে অনেকেই খালি পায়ে মার্চ করতে বাধ্য হন। গেরিলা বাহিনীর যোগাযোগের জন্যে টেলিফোন বা ওআরলেসের কোন ব্যবস্থা করা যায়নি। এর ফলে ফৌজকে যুদ্ধে মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। শেষে আরও বলা যায় যে জাপানী সামরিক অধিকর্তা লেঃ জেনারেল কাওআবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে মূল যুদ্ধে অংশ নিতে দেওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত বাধা সৃষ্টি করছিলেন। নেতাজী দৃঢ়ভাবে জানান আজাদ হিন্দ্ ফৌজই আক্রমণের পুরোভাগে থাকবে এবং ভারত ভূখণ্ডে সমস্ত নারী-পুরুষের প্রাণ, মর্যাদা ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব কেবল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের। কোন ভারতীয় অথবা জাপানী সৈন্য ভারত ভূখণ্ডে লুঠ বা ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে তিনি ফৌজকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার অগ্রিম নির্দেশ দিয়ে রাখেন। জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় দশটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চুক্তি হয়। এগুলি হল :—

১। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর সমমর্যাদা থাকবে এবং সামরিক সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও এই সমতা পালিত হবে।

২। সাধারণ রণকৌশলের ভিত্তিতে দুটি বাহিনী কাজ করবে।

CENTRAL LIBRARY

৩। যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত কম্যাণ্ডের প্রধান থাকবেন বয়োজ্যেষ্ঠ মেজর জেনারেল ইয়ামামোতো। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ইউনিট এবং উপদলগুলি কেবল নিজেদের অফিসারের নির্দেশে চলবে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জাপানের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না।

৪। ফৌজের নিয়তম বিভাগ হবে ব্যাটেলিয়ান, কেবলমাত্র গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগের বিভাজন অন্যরকম হবে।

৫। ফৌজের লোকেরা 'আই. এন. এ. অ্যাক্ট'-এর অধীনে থাকবেন, জাপানী সামরিক আইন বা পুলিসী ব্যবস্থা তাদের উপরে বলবৎ হবে না।

৬। মুক্ত ভূখণ্ডগুলি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের হাতে অর্পণ করা হবে।

৭। স্বাধীনভাবে লড়াইয়ের জন্যে ফৌজ আলাদা ক্ষেত্র পাবে।

৮। ভারত ভূখণ্ডে কেবলমাত্র ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকাই উড়বে।

৯। কলকাতার উপরে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা চলবে না।

১০। কোনো জাপানী অথবা ভারতীয় সৈন্যকে ধর্ষণরত দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করা হবে।[৪৩]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লড়াই—আরাকান, কালাদান, হাকা ও ফালাম, কোহিমা, ইম্ফল প্রভৃতি রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রচণ্ড লড়াই হয় এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। **আরাকান** রণাঙ্গনে ব্রিটিশ বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এখানকার লড়াইয়ে লেঃ কর্ণেল মিশ্র এবং মেজর মেহর দাস অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ সপ্তম ডিভিশন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং বুথিয়াডং অধিকৃত হয়। লেঃ হরি সিং বীরত্বের জন্যে শের-ই-হিন্দ্ উপাধিতে ভূষিত হন। **কালাদান** রণাঙ্গনে মেজর রাতুরির (সর্দার-ই-জঙ্গ্) বাহিনীর বীরত্বে ফৌজ পালেতোয়া এবং দালেতিন দখল করে নেয়। এই জায়গাগুলি ছিল চট্টগ্রাম সীমান্তের কাছে এবং এখান থেকে ভারত ভূখণ্ড মাত্র চল্লিশ মাইল দূর ছিল। এর পরে এই বাহিনী ভারতের অন্তর্গত মাওডক ঘাঁটি দখল করে ভারতে পদার্পণ করে (মে ১৯৪৪)। মাওডক আক্রমণে ক্যাপ্টেন শুরধমল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। আসাম সীমান্তে **হাকা এবং ফালাম** রণাঙ্গন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অঞ্চল ছিল কালেওয়া থেকে টামু এবং কালেওয়া থেকে তিদ্দিমের সংযোগপথ। এই দুটি জায়গাই আবার ভারতের মধ্যে অবস্থিত। তিদ্দিমের পশ্চিমে আইজল

CENTRAL LIBRARY

এবং বিষেণপুরের উত্তর পশ্চিমে শিলচর—এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ শহর রয়েছে। এই রণাঙ্গনে রাস্তা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং পরিবহণের জন্যে কোনো পশুও ছিল না। বাহিনীর যাবতীয় সরঞ্জাম সৈনিকদের নিজেদেরই বহন করতে হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই অঞ্চল জাপানী সৈন্য বাহিনীর হাতে ছিল ততদিন পর্যন্ত বার্মা সীমান্তের অভ্যন্তরে ব্রিটিশবাহিনী ছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এই এলাকার দখল নেবার পরেই শত্রুকে বার্মা ছেড়ে ভারতের অভ্যন্তরে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। লেঃ সেহ্‌না সিং এবং মেজর মেহ্‌বুব আমেদ এই রণাঙ্গনে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে দুটি ঘাঁটি দখল করেন।

ভারতের অভ্যন্তরে **কোহিমায়** আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ১৯৪৪ সালের মার্চের প্রথমেই ঢুকে পড়ে ক্যাপ্টেন মগ্‌গর সিং, অমর সিং এবং দলপতি সিংহের পরিচালনায়। মুক্তাঞ্চলের প্রশাসন ভার গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষে আজাদ হিন্দ্ দল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও জাপানী বাহিনীর মিলিত আক্রমণে কোহিমার পরে উখরুল এবং তারপরে ডিমাপুর দখল করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু জাপানী রণকৌশলগত ত্রুটি, সাংঘাতিক খাদ্যাভাব, প্রচণ্ড পাহাড়ী বর্ষার ফলে সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত অবস্থা এবং শত্রুপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মিলিত বাহিনী শীঘ্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া জাপানীদের দুর্ব্যবহার ও ইংরেজদের ঘুষ প্রদান প্রভৃতির ফলে পাহাড়ী চীন এবং নাগা উপজাতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন নাগারাও জাপানী দুর্ব্যবহারের শিকার হয়। কোনরকম খাবার না থাকায় ফৌজের সৈনিকদের এখানে ঘাস সিদ্ধ করেও খেতে হয়েছে। এখানে জাপানী বাহিনীর সঙ্গে যে শুধু নাগাদেরই সম্পর্ক খারাপ ছিল তা নয়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সঙ্গেও তারা দুর্ব্যবহার করতে থাকে, যার ফলে কখনো কখনো সংঘর্ষ হবারও উপক্রম দেখা দেয়। যুদ্ধ শুরু হবার আগে নেতাজী ফৌজের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, "আপনারা যদি কখনো দেখেন যে জাপানীরা ভারতের উপর কোনদিক থেকে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি দাঁড়াবেন এবং যেমন সাংঘাতিক ভাবে আপনারা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়বেন, তেমন ভাবেই তাদের সঙ্গেও লড়বেন।"

ইম্ফল রণাঙ্গনেই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সবচেয়ে আগে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুআরি ভারতের মাটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। মোরে এবং টামু দখল করা হয় এবং ব্রিটিশবাহিনী মণিপুরে পলায়ন করে। এই রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজীর রণকৌশলগত ভুলের জন্যে জাপান

CENTRAL LIBRARY

কিয়ানীর অধীনস্থ ১ম ডিভিশনের সঙ্গে শাহ্‌নওয়াজ খানের অধীনস্থ ১ম ব্রিগেডকে একসঙ্গে মেলানো হয়নি। কর্ণেল মালিকের নেতৃত্বে একটি ছোট সামরিক দল বিষেণপুর দখল করে নেয়। এর পরে ৩০০০ সুসজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ৬০০ আজাদী সৈনিক নামমাত্র রেশন এবং অস্ত্র নিয়ে অবিশ্বাস্য লড়াই চালিয়ে ছামোল, মিথা খাঙ্গোল, পালেল সামরিক বিমানঘাঁটি দখল করে। উপযুক্ত সরবরাহের অভাবে পালেল দখল করলেও দীর্ঘদিন দখলে রাখা সম্ভবপর হবে না বুঝে বিমানঘাঁটি এবং সামরিক বিমানগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধগুলিতে মেজর প্রীতম সিং (সর্দার-ই-জঙ্গ্‌), ক্যাপ্টেন সাধু সিং, লেঃ লাল সিং, মেজর (ডঃ) আকবর আলী শাহ্‌, ক্যাপ্টেন রাও, লেঃ মনস্থখলাল, লেঃ অজায়েব সিং প্রমুখ অসামান্য বীরত্বের নিদর্শন রাখেন।

ইম্ফল রণাঙ্গনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মুক্তাঞ্চলে আজাদ হিন্দের প্রশাসন। এই অঞ্চলে নাগারা বিশেষ করে এবং কাছাড়ীরাও ফৌজকে সমস্তরকম সাহায্য করেন। দু'শ বর্গমাইল মুক্তাঞ্চলে আজাদ হিন্দের প্রশাসনে এঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আগ্রহের সঙ্গে তাতে অংশ নিতেন। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের নিয়ন্ত্রণে জাপানীরা কোনো দুর্ব্যবহার করার সুযোগ পেত না। যখন খাদ্যের অভাবে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন এঁরা আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজকে তা করতে বারণ করেন এবং নিজেরা যতদূর সম্ভব খাদ্য যোগাড় করে দেবার চেষ্টা করেন।[৪৪]

যুদ্ধের অগ্রগতির ফলে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ্‌ সরকার, ফৌজ এবং লীগের অগ্রবর্তী সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় মেমিওতে। এই সময়ে মুক্তাঞ্চলের গ্রামবাসীরা দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্যে সবসময়েই ফৌজের কাছে আসত, আজাদ হিন্দ্‌ সরকারকে জনপ্রিয় 'নঈ সরকার' নামে ডাকা হত। এইসব কারণে বেসামরিক প্রশাসন ও রাজনীতিক কার্যকলাপ চালাবার জন্যে আজাদ হিন্দ্‌ দলকে দ্রুত মুক্তাঞ্চলে পাঠানোর চেষ্টা হয়। যদিও পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতির ফলে সময়মত তাদের পাঠানো যায় নি। একই প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনিক আইন ও নির্দেশাবলী তৈরি করা হয়। বিস্তারিত প্রশাসনিক বিভাগে গ্রামকে একক (unit) ধরা হয় এবং গ্রামের প্রশাসনিক ও উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্বাচিত 'মণ্ডল' বা 'মুখিয়া'র হাতে। 'মুখিয়া' এবং 'বিশবরা' রা (কুড়িটি পরিবারের উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত) গ্রামের পঞ্চায়েতের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। প্রত্যেকের কাজ ও ক্ষমতার এক্তিয়ার স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। দশটি গ্রাম মিলে একটি 'দশ গাঁও' তৈরি

CENTRAL LIBRARY

হবে এবং তার একজন আধিকারিক থাকবেন। পাঁচটি পর্যন্ত দশগাঁও নিয়ে একটি 'দাইরা' বা বৃত্ত তৈরি হবে এবং একজন দাইরা আধিকারিক থাকবেন। অনধিক পাঁচটি দাইরা নিয়ে তৈরি হবে মহকুমা যার প্রশাসন চালাবেন মহকুমার আধিকারিক। অনধিক পাঁচটি মহকুমা নিয়ে জেলা তৈরি হবে এবং জেলা আধিকারিকদের সমন্বয় করবার দায়িত্ব থাকবে মুক্তাঞ্চলের আজাদ হিন্দ্ অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তরে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র সচিবের হাতে।[৪৫] মনে রাখতে হবে যে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী অবস্থার জন্যে।

এই সময়ে আজাদ হিন্দ্ সরকার স্বাধীনভাবে অর্থনীতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্যে এক কোটি টাকা মূলধন নিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ জাতীয় ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করে। ডি. এন. ভাদুড়ীকে এর ম্যানেজিং সেক্রেটারির পদে নিয়োগ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে নানা অঙ্কের নিজস্ব কারেন্সি নোট ছাপতে দেওয়া হয়। ডাকটিকিটও বিভিন্ন দামে বাজারে ছাড়া হয়। সরবরাহ বিভাগকে ঢেলে সাজানো হয়। একটি রাজস্ব 'মন্ত্রক'ও গঠন করা হয়। ফৌজের জয়লাভের ফলে দক্ষিণ পূর্ব এশিআয় ভারতীয়দের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বর্মীদের সমর্থন ও উৎসাহও যথেষ্ট লক্ষ্যণীয় ছিল। এছাড়া মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল এন্‌জিনিয়ারিং, ও আধুনিক চাষ প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দান শুরু হয় এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নিজস্ব উৎপাদন শুরু করে দেওয়া হয়।[৪৬]

পশ্চাদপসরণ :—বর্ষাকাল এসে যাওয়ায় সীমান্ত অঞ্চলে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। খাবার, অস্ত্র এবং ওষুধপত্রের যোগান কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। সাংঘাতিকভাবে উদরাময় এবং ম্যালেরিয়া ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং অসুস্থ সৈনিকরা তবুও আরো আক্রমণ চালাবার জন্যে উৎসুক ছিল। কিন্তু ইম্ফল দখল করতে পারলেও দীর্ঘদিন রক্ষা করা যেত না। কারণ ইঙ্গ-আমেরিকান বিমানবাহিনী একটানা আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং তাদের বাহিনীর জন্যে নতুন রসদ সরবরাহ করছিল। অপরদিকে কোনো জাপানী বিমান রণাঙ্গনে ছিল না। এর ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, যদিও এর ফলে সৈনিকদের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। দীর্ঘ পথ পশ্চাদপসরণের সময়ে ফৌজকে শত্রুসৈন্যের আক্রমণ, বন্যা, মড়ক, বিষাক্ত সাপের কামড় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

অক্টোবর মাসে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং পুনরাক্রমণের প্রস্তুতি চালানোর জন্যে ১২ জনকে নিয়ে নেতাজী একটি 'যুদ্ধ পরিষদ' গঠন করেন। লড়াইয়ের এই

পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানীদের বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, দুর্ব্যবহার, ভুল তথ্য সরবরাহ করা প্রভৃতি বিষয়ে খোলাখুলি বোঝাপড়ার জন্যে নেতাজী সামরিক সঙ্গীদের নিয়ে টোকিও যান। এখানে নতুন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসো, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমোরু শিগেমেৎসু প্রমুখের সঙ্গে অনেকগুলো বৈঠক হয় এবং নতুন সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়। এর সঙ্গে আবারও জাপান সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ভারতে ভূখণ্ডকেন্দ্রিক, সামরিক, অথবা আর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তারের কোনো ইচ্ছা জাপানের নেই এবং আজাদ হিন্দ্ সরকারকে প্রদত্ত সাহায্যের জন্যে কোনো বিশেষ সুযোগও সে দাবী করে না। এই আলোচনার ফলে জাপানী সংযোগরক্ষাকারী দফ্তর হিকারি কিকানকে অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়।[৪৭]

কিন্তু শত্রু উত্তর দিক থেকে অতিদ্রুত প্রবল আক্রমণ শুরু করে এবং মিঙ্গিয়াং-এর কাছে ইরাবতী নদী অতিক্রম করায় যুদ্ধের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। এই সময়ে ২য় ডিভিশন থেকে চারজন প্রবীণ অফিসার শত্রুপক্ষে যোগ দেন। তবুও ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে টাউঙ্গজিং, ডাউঙ্গল প্রভৃতি জায়গার লড়াইতে ফৌজের সৈনিকরা প্রবল মনোবল, সাহস ও শৌর্যের প্রমাণ দেন।[৪৮]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রথম থেকে জাপানী বাহিনীকে তার উপরে কোন সুযোগ নিতে দেয়নি, এবং ভারত ভূখণ্ডে তারা যাতে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে ফৌজ সে ব্যাপারে সতর্ক ছিল। কিন্তু বর্মী বাহিনী প্রথম থেকে সুযোগ নিতে দেওয়ায় জাপানীরা বর্মীদের প্রতি ক্রমে দুর্ব্যবহার বাড়াতে থাকে। এর ফলে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে বর্মী প্রতিরক্ষাবাহিনীর মধ্যে কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত মেজর জেনারেল আউঙ্গ সাং-এর নেতৃত্বে জাপ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। জাপান এই বিদ্রোহ দমনের জন্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাহায্য চাইলে আজাদ হিন্দ্ সরকার দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। এই বিদ্রোহের ফলে জাপানী আধিপত্য বার্মা থেকে নির্মূল হয়। কিন্তু এর ফলে ফৌজের কোনো অসুবিধে হয়নি বরং বর্মীবাহিনীর সঙ্গে তাদের মৈত্রী শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল।[৪৯]

১৯৪৫ সালের ২৯ এপ্রিল রেঙ্গুন আবার ব্রিটিশবাহিনীর দখলে চলে যায়। এর আগে যখন বোঝা গিয়েছিল যে জাপ বাহিনী রেঙ্গুন ছেড়ে পিছু হটবে, তখন আজাদ হিন্দ্ **মন্ত্রিসভার** জরুরী বৈঠকে স্থির হয় নেতাজী রেঙ্গুন ত্যাগ করে মালয়ে ফিরে যাবেন, সেখানে ৩য় ডিভিশনকে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি করবেন এবং নতুন করে বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ শুরু করার ব্যবস্থা করবেন। যদি অবস্থা

CENTRAL LIBRARY

আরো খারাপ হয়, নেতাজী বিশেষ কয়েকজন অফিসার এবং একটি পুরো রেজিমেন্ট সমেত চীনে আশ্রয় নেবেন এবং জাপান যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সোভিয়েত ইউনিঅনে যাবার চেষ্টা করবেন। নেতাজীর স্পষ্ট ধারণা ছিল যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হলেও ব্রিটেনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য রকম হ্রাস পাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের মূল কেন্দ্রে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যেই যে সোভিয়েত ইউনিঅন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধরত দুটো শিবিরে সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে যাবে এবং তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করবে—এরকম ধারণা নেতাজীর ছিল। এর জন্যেই তিনি সোভিয়েত ইউনিঅনে যেতে চাইছিলেন।[৫০] নেতাজীর দ্বি-মেরু বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদৃষ্টি সঠিক ছিল। কিন্তু তখনও পরমাণু অস্ত্রের প্রসার না হওয়ায় ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না।

২৯ এপ্রিল রেঙ্গুনের পতনের আগে পর্যন্ত মেজর জেনারেল লোগনাথন কর্ণেল আরসাদের বাহিনী নিয়ে এখানে থেকে যান এবং বার্মার রাষ্ট্রপতি ডঃ বা ম অন্তর্বর্তীকালে রেঙ্গুনের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হন। কর্ণেল আরসাদ যথোপযুক্ত ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।[৫১]

এরপর নেতাজী ও তাঁর বাহিনী পায়ে হেঁটে সিত্তাং নদীর পশ্চিমপ্রান্তে আসেন এবং নিরন্তর আক্রমণের মধ্যে নদী পার হয়ে মৌলমিনে পৌঁছন। প্রাংকাশি হয়ে মে মাসের শেষে তাঁরা ব্যাঙ্কক পৌঁছন। এখান থেকে পুরো ফৌজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে নেতাজী সমগ্র মালয় ব্যাপকভাবে সফর করেন। নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের শহীদদের স্মরণে জুলাই মাসে শহীদ বেদীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বেদীটি অগস্ট মাসে তৈরি শেষ হয়। এর রূপকার ছিলেন কর্ণেল স্ট্যাচি। ব্রিটিশ ফৌজ যখন আবার সিঙ্গাপুর দখল করে তখন ডিনামাইট দিয়ে বর্বরভাবে এই শহীদবেদীটি ধ্বংস করে দেয়। তাদের ভয় ছিল এই শহীদবেদী দেখলে ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহী হতে পারে। শহীদবেদীটি ধ্বংস করার পরে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আত্মসমর্পণের পরেও প্রত্যেকদিন এই ধ্বংসস্তূপের উপরে বেসামরিক জনগণ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করতেন। এই জনগণ শুধু ভারতীয় নয়—প্রচুর চীনা এবং মালয়ী জনগণও এই কাজ নিয়মিত করতেন বলে জানা যায়। কোনভাবেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এটা বন্ধ করতে পারেনি। এই ঘটনার মাধ্যমে স্থানীয় চীনাসমাজ ভারতীয়দের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[৫২]

CENTRAL LIBRARY

সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে ১৮, ১৯, ২০ এবং ২৬ জুনে প্রদত্ত বেতার ভাষণে পাকিস্তান প্রস্তাব তথা দেশভাগ করার চেষ্টা এবং ওআভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যে মর্মস্পর্শী আবেদন জানান। সায়গন থেকেও এ. সি. চ্যাটার্জী এবং এস. এ. আয়ার আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষে নেতাজী এবং ফৌজের পুরো একটি ব্রিগেডকে চীনে পাঠাবার এবং রাশিআর সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে শেষ চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে শেষবারের মতো অর্থসংগ্রহ করার জন্যে চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৫ সালের ১০ অগস্ট জাপান চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। নেতাজী ১৩ অগস্ট এ. সি. চ্যাটার্জীকে সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী চ্যাটার্জী চারকোটি পিয়েস্ত্রা মূল্যের সম্পদ সমেত সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছন। কিন্তু পথে কয়েকঘণ্টা অস্বাভাবিক দেরি হওয়ার জন্যে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। কারণ নেতাজী অল্প আগেই ব্যাংকক চলে যান। সেখান থেকে সায়গনে পৌঁছে তিনি ১৮ অগস্ট অজ্ঞাত কোনো জায়গায় চলে যান। যদিও তিনি তাঁর সঙ্গে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী এবং উপদেষ্টাকে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষমুহূর্তে জাপানী কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানায় যে বিমানে তিনি ছাড়া আর মাত্র একজনের বসবার জায়গা আছে। ফলে নেতাজী কর্ণেল হবিবুর রহমানকে সঙ্গে নেন। এর পরে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি এবং ২২ অগস্ট টোকিও বেতার থেকে ঘোষণা করা হয় যে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় ১৮ অগস্ট মারা গেছেন। কিন্তু তখন এই খবর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কোনো অফিসার বা আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রীরা বিশ্বাস করেন নি।[৫৩]

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মোটামুটি সমস্ত আজাদ হিন্দ্ মন্ত্রী ও সামরিক অফিসার, জওয়ানেরা দক্ষিণ পূর্ব এশিআর নানা দেশে আত্মসমর্পণ করেন। এর পরে এঁদের ভারতে আনা হয় এবং লালকেল্লায় মেজর জেনারেল শাহ্নওয়াজ খান, কর্ণেল পি. কে. সেহ্গল, লেঃ কর্ণেল জি. এস. ধিলোঁ এবং আরো অনেকের ঐতিহাসিক বিচার ভারতীয় জনগণকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা তাঁদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর মধ্যে এই বিচারের ঘটনার প্রেরণায় বিদ্রোহ দেখা দেয়।[৫৪]

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যর্থ হবার কারণ

ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধীনে প্রথম আই. এন. এ. ভেঙে যাবার কারণ ছিল আভ্যন্তর বিরোধ, নেতৃত্বের অভাব এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস প্রভৃতি। কিন্তু

CENTRAL LIBRARY

নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আগের থেকে অনেক বেশী সংঘবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এবং কিছুটা সফল হলেও যে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার নিম্নলিখিত কারণগুলি ছিল—

জাপানী রণকৌশল ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যুদ্ধের প্রথম পর্বে আরাকান পাহাড় এবং কালাদান উপত্যকায় জাপান ব্রিটিশ সপ্তম ডিভিশনকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে কোহিমা এবং তৃতীয় পর্যায়ে ইম্ফল এলাকায় লড়াইয়ের ব্যাপারে জাপানের পুরো হিসেবেই ছিল মারাত্মক ত্রুটি। জাপ সেনাপতিরা সব সময়েই ঝটিকা আক্রমণ (blitz) পছন্দ করতেন। এই কারণে কোহিমা ও ইম্ফলের যুদ্ধে সৈন্যদের সঙ্গে কেবল দশ দিনের রেশন দেওয়া হয়েছিল। সেনাপতিরা শত্রুকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ভুল সামরিক তথ্য এবং অনুমানের বশে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে শত্রুর শক্তি বেশি হবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষের হাতে পর্যাপ্ত রেশন ছিল—তা দিয়ে দশদিনের অনেক বেশী দিন লড়াই করা সম্ভবপর ছিল।

শত্রুপক্ষের পর্যাপ্ত সামরিক বিমানও ছিল। এর ফলে বেশী শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে যখন জাপবাহিনী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মিলিত সৈন্যদল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে, তখন শত্রুপক্ষ মরিয়া হয়ে সবলে লড়াই করে। তাদের পিছু হটবার পথ না থাকার জন্যেই তারা এভাবে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যদি তাদের পিছু হটবার পথ খোলা রাখা হত, তবে তাদের পালাতে দিয়ে এবং পিছু ধাওয়া করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও জাপ বাহিনী ভারতের আরও ভিতরে ঢুকে পড়তে পারতো। বিশেষত, বর্ষাকাল শুরু হবার আগে তা হলে যুদ্ধের ফল অন্যরকম হবার সুযোগ থাকত।

এছাড়া এই দুটি রণাঙ্গনে সামরিক বিমান না পাওয়ার কারণ জাপানী সেনাপতিদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ। জাপ বাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে জেনারেল ইয়ামাশিটা এবং জেনারেল কাওআবে ভারতীয় রণাঙ্গনকে কখনওই গুরুত্ব দেননি। এঁদের মধ্যে প্রথমজন ফিলিপাইন্স্ দ্বীপপুঞ্জে বেশীরভাগ জাপানী সামরিক বিমানকে নিজের এক্তিয়ারে দখল করে রাখেন। অপরদিকে জেনারেল তোজো এবং লেঃ জেনারেল মোতাগুচি ভারত রণাঙ্গনের সামগ্রিক গুরুত্ব বুঝে-ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বিমান সাহায্য ও অন্যান্য ব্যাপারে এই রণাঙ্গনে অনুসৃত রণকৌশলকে প্রভাবিত করতে পারেননি। আগে যে সামরিক ভুল তথ্যের কথা বলা হয়েছে তা আসে জাপ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে। এই

CENTRAL LIBRARY

বিভাগ বিভিন্ন সময়েই ভুল তথ্য সরবরাহ করে যুদ্ধের দারুণ ক্ষতি করে। সামরিক গোয়েন্দা দফ্‌তরের কর্তা লেঃ কর্ণেল ফুজিওআরা নিজেও পরে একথা স্বীকার করেন। এইসব কারণেই চট্টগ্রাম, কালাদান, কোহিমা প্রভৃতি রণাঙ্গনে জাপ ও আজাদ বাহিনী পরাজিত হয়।

জাপানী সরবরাহ ব্যবস্থাও ছিল বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। জাপ ও আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের মিলিত বাহিনীর জন্যে যত রসদের প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম করে জাপান সরকার হিসেব করেছিল। এছাড়া তাদের ধারণা ছিল যে ইম্ফল রণাঙ্গনে জিতে মিলিত বাহিনী শত্রুপক্ষের কাছ থেকে প্রচুর রসদ দখল করবে। আত্মস্তরিতা এবং বাস্তবতা বোধের অভাবের জন্যে এইরকম সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ব্যাপারের উপরে নির্ভর করা হয়েছিল। কল্পনাশ্রয়ী ধারণার মাশুল মিলিত বাহিনীকে পরাজয়ের মাধ্যমে দিতে হয়েছে।

জাপানী পরিবহণ ব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল। পরিবহণের গাড়ি এবং যন্ত্রাংশ অপর্যাপ্ত ছিল। পাহাড়ী অঞ্চলের উপযুক্ত কোন পরিবহণ ছিল না।

ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল সামরিক সংযোগের জন্যে প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট তৈরি করা অথবা ওআরলেস এবং টেলিফোন সরবরাহ করার ব্যাপারে জাপানী কর্তৃপক্ষ ফৌজকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সহায়তা করেনি। আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ এবং সরকারের একটি বড় কৌশলগত ত্রুটি ছিল সমস্ত সরবরাহের জন্যে প্রথমদিকে একমাত্র জাপানের উপর নির্ভর করা। যদিও বর্মী জনগণ খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল তবু প্রথম থেকেই প্রয়োজনীয় রসদ স্থানীয় জায়গা থেকে সংগ্রহ করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। শেষকালে যখন সে চেষ্টা হয় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পক্ষকাল আগে থেকে বর্ষণ শুরু হয়। ফৌজের সৈন্যদের বর্ষাতি না থাকায়, এমন কি সবসময়ে মাথা গোঁজার জায়গা না থাকায় ও রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এব্যাপারেও পরিকল্পনার অভাব ছিল।

খাদ্যসংকট ক্রমে চূড়ান্ত রূপ নেয়—প্রত্যেক সৈন্য কেবল দশদিনের রেশন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অপরদিকে মাল পরিবহণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় দশদিন সময়ের পরেই খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এমনকি যুদ্ধের ফলে শত্রুপক্ষের যেসব ভারতীয় সৈন্য ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের খাদ্যাভাবের জন্যেই ফৌজে না নিয়ে ফিরে যেতে বলা হয়। এসবই রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে

CENTRAL LIBRARY

অজ্ঞতার ফলে হয়েছে। জাপ বাহিনীর এ সম্পর্কে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ফৌজেরও নিজস্ব ব্যবস্থায় আগে থেকে তথ্য সংগ্রহের উপরে আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল।

ভারতের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রাণান্তকর সংগ্রাম সমর্থন করেননি। কমিউনিস্ট পার্টি'ও জাপানকে রুখবার জন্যে প্রচার করে এবং সুভাষচন্দ্রকে জাপানের এজেন্ট বলে প্রচার করে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিজেরও প্রচার ব্যবস্থায় খুঁত ছিল। প্রচারপত্র ছাপানো হলেও অব্যবস্থার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে বিলি করা হয় নি। অপরদিকে, জাপানী কর্তৃপক্ষ বিমান থেকে প্রচারপত্র বিলি করতে অস্বীকার করে। প্রচার-পত্র বিলি করার ব্যাপারে জাপানের উপরে নির্ভরতা ক্ষতি করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং ভারতের মধ্যে বেসামরিক জনগণের ভিতরে যদি ঠিকমত প্রচার চালানো সম্ভবপর হত তবে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সফল গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর সম্ভাবনা প্রসারিত হত। বিপরীতে ভারতের মধ্যে এবং সীমান্তে ব্রিটিশ প্রচার ব্যবস্থা ছিল অনেক আধুনিক, নিখুঁত এবং শক্তিশালী।

পরিশেষে বলা যায় যে ব্রিটিশ-মার্কিন বাহিনী ট্যাংক, আরমার্ড কার, বোমারু ও পরিবহণ বিমান প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তার তুলনায় ফৌজ ও জাপ বাহিনী অনেক সেকেলে ছিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যাও বেশী ছিল। আজাদী সৈন্যরা প্রধানত মনোবলে লড়াই করেছেন এবং কোথাও কোথাও ট্যাংকের সঙ্গে তাঁরা লড়েছেন গ্রেনেড, হাতবোমা বা পেট্রলের টিন নিয়ে। এই অসম যুদ্ধে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে যদিও ফৌজ ও জাপ বাহিনীর প্রতি সৈন্য গড়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ছয়জনকে নিধন করে মারা যান (১:৬), তবুও এভাবে যুদ্ধ জয় করা যায় না।[৫৫]

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের সাফল্য

উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের সাফল্যের মধ্যে কোন কোনটি ছিল সুদূরপ্রসারী ও সামাজিক, কিছু রাজনীতিক এবং কোনটি বা তাৎক্ষণিক ফলদায়ী। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানগুলির কথা নীচে দেওয়া হল—

CENTRAL LIBRARY

ভারতীয়দের নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্তি বাহিনী তৈরি করা। এর রাজনীতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অসীম।

ভারতীয় নারীদের নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নারী বাহিনী গঠন করা। নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশিকা।

আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনই প্রথম অস্থায়ী সরকার সংক্রান্ত রাজনীতিক ধারণা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সফলভাবে প্রয়োগ করে। তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব এশিআর ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনার বিস্তার ঘটায়। নিজস্ব সরকার ও ফৌজ থাকায় দক্ষিণ পূর্ব এশিআয় ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এবং জাতির (caste) সৈনিকদের জন্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে এক হেঁসেল এবং পঙ্‌ক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।[৫৬] আন্তঃসাম্প্রদায়িক, আন্তঃপ্রাদেশিক এবং নানান জাতি ও বর্ণের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রেরণায় বিবাহ চালু হয়। তাছাড়া বেসামরিক ভারতীয় জনগণের মধ্যেও ফৌজের প্রেরণায়, আজাদ হিন্দ্ সরকারের নেতৃত্বে এবং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের তৎপরতায় প্রকৃত জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। জাতীয় ভাষা, বর্ণমালা, পোশাক, সম্বোধন প্রভৃতির সাহায্যে ও পক্ষপাতহীনতার ফলে প্রাদেশিক, ভাষাগত, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি বিভেদ দূর করার সর্বোত্তম উদাহরণ স্থাপিত হয়।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের অভ্যন্তরে ১০০ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে সমর্থ হয় এবং বহুশত বর্গমাইল এলাকা দখল করে।[৫৭] আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তার নিজস্ব অধিনায়কত্বে এবং সামরিক আইনের (I. N. A. Act) বলে বলীয়ান ছিল। এই আক্রমণ সফল না হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৮০%. ভারতীয় সৈনিক এবং দশ হাজার ভারতীয় অফিসারের মধ্যে আট হাজার ভারতীয় সামরিক অফিসার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভারতীয় নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং স্থলবাহিনীর একাংশের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ সৈনিকদের লাল কেল্লায় বিচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়।[৫৮] একই কারণে জনসাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে জঙ্গী জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এক কথায় বলা যায়, যুদ্ধে চূড়ান্ত বিচারে হেরে গেলেও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান করার জন্যে শেষ আঘাত দিয়ে যায়।

CENTRAL LIBRARY

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং হিউ টয় মনে করেন যে আজাদ হিন্দ্ সেনানীদের লালকেল্লায় বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনগণের মনে আজাদ হিন্দ্ আন্দোলন সম্পর্কে যে বিপুল সমর্থন এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রবল ঘৃণা তৈরি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হন জাতীয় কংগ্রেসের নেতারাই, কারণ ইংরেজ শাসনের অবসানের পরে তাঁরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[৫৯]

অষ্টম অধ্যায়
সামগ্রিক মূল্যায়ন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা বিশ্বের রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে যুগান্তর এনে দিয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের দিক থেকে দেখতে গেলে এই মহাযুদ্ধ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের শেষ অধ্যায় সূচিত করেছে। সামগ্রিক ভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পর্বে এসে সবচেয়ে ব্যাপকতা এবং তীব্রতা লাভ করে। এসময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সরকারও অনেক কঠিন চাপের মুখে পড়ে। ভারতে এবং ব্রিটেনে আভ্যন্তর চাপের পাশাপাশি এই সময়ে আন্তর্জাতিক চাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী উপাদানগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিঅনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের প্রায় প্রথম পর্ব থেকেই ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্রিটেনের উপরে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলেও আর্থনীতিক ভাবে ব্রিটেনের অবস্থা অত্যন্ত নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে সে অনেক বেশী নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং তার আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ভূমিকাও খর্ব হয়।

সেই সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপস্থিত হওয়ায় এর অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। এগুলিকেই এই পর্বের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। নীচে এগুলির কথা উল্লেখ করা হল।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ এই দেশে বিকাশ লাভ করতে থাকে। সেই কারণে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ

CENTRAL LIBRARY

ব্যবস্থা সেই অনুযায়ী উন্নতি লাভ করে। জাতীয় অর্থনীতির সূত্রপাত হয় এবং ইংরেজী শিক্ষার বিকাশ ও শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল ভারতে গণবিপ্লব ও বিদ্রোহ রোধ করবার উদ্দেশ্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসার হিউমের উদ্যোগে একটি 'সেফটি ভাল্‌ভ্‌' তৈরি করা। তাছাড়া নবোদ্ভূত ব্রিটিশনির্ভর ভারতীয় শ্রেণীগুলিও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতের তৎকালীন বড়লাট এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। প্রথমদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব উদারপন্থী উচ্চ মধ্যবিত্তদের হাতে থাকলেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে মধ্যবিত্ত চরমপন্থী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতাদের হাতে চলে যায়। এবং এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় (১৯০৩-১৯০৮)।[১] ১৮৮৭ সালে বাংলায় পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রথম সংগঠন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও পুঁজিপতি শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন গড়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জন এবং স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহ দান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হওয়ায় বিকাশমান ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী এই আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে কংগ্রেসের উপরে শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা চালাতে থাকে। ইওরোপীয়দের জন্যে ব্রিটিশ সরকারের সংরক্ষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্যে তাদের কংগ্রেসের মতো রাজনীতিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দরকার ছিল।[২] অপর দিকে শিল্প শ্রমিকরাও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যবর্তী সময় থেকে সচেতন ভাবে আন্দোলন সংগঠন করতে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই শ্রমিক সংগঠনও গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২০ সালে সারাভারত ট্রেড ইউনিঅন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের রাজনীতিক ভূমিকা নতুন স্তরে উন্নীত হয়। শ্রমিক এবং মালিক শ্রেণী সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী স্বার্থের তাগিদে কংগ্রেসের কর্মসূচীতে অংশ নিতে থাকে ও সমর্থন করতে থাকে, যদিও ব্রিটিশ বিরোধিতার একটি ঐক্যভূমি বড় আন্দোলনগুলির সময়ে সাময়িকভাবে তৈরি হত। দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্ব কংগ্রেস রাজনীতিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে রাজনীতিক পার্থক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করত।[৩]

১৮৯৩ সালে লর্ড কর্নওআলিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-র ফলে উদ্ভূত জমির উপসত্বভোগী জমিদারশ্রেণী ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগেই ১৮৫১ সালে

CENTRAL LIBRARY

তাদের প্রধান সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিআন অ্যাসোসিয়েশান প্রতিষ্ঠা করে। এই সংগঠন সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের তোষামোদ করত। এমন কি, কংগ্রেসের সমসাময়িক এবং একই চরিত্রের ইণ্ডিআন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত লিটন প্রবর্তিত 'প্রেস অ্যাক্ট' এর বিরুদ্ধে আহুত সভায় এই সংগঠন আমন্ত্রিত হয়েও যোগ দেয়নি'।[৪] ধীরে ধীরে জমিদাররাও কংগ্রেস সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকলে, স্থানীয় প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন ও আইনসভায় কংগ্রেসের মনোনয়ন পাওয়ার জন্যে অনেক জমিদারই লালায়িত হয়ে ওঠেন। নিজেদের প্রতিপত্তি এবং চাষী প্রজাদের উপর আধিপত্যের জন্যে কংগ্রেস মঞ্চ তাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৫]

অপরদিকে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদ ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কৃষকদের উপরে শোষণ তীব্রতর হয় এবং নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সমেত আরো বহু কৃষক বিদ্রোহ ও আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত হয়।[৬] বর্তমান শতাব্দীতে কৃষক সংগ্রাম ধীরে ধীরে সংগঠিত রাজনীতিক চেহারা নিতে থাকে। ১৯১৭-১৮ সালে বিহারের চম্পারণে এবং ১৯২৮ সালে গুজরাটের বাড়দোলিতে কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছিল। শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করা হয়। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কিষাণসভা গঠন কংগ্রেস রাজনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে।[৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ, ত্রিশ দশকের শেষভাগ থেকে বামপন্থী সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলি যে কংগ্রেস রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, এ কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সাধারণভাবে বলতে গেলে বামপন্থীদের প্রধানভাবে দুটি ক্ষেত্রে ঐক্যমত ছিল যেদিক থেকে তাঁরা দক্ষিণপন্থীদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। প্রথমত, বামপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন যা দক্ষিণপন্থীরা ছিলেন না (এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীরা কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন তীব্রতর করার পক্ষে ছিলেন, দক্ষিণপন্থীরা এ ধরনের আন্দোলন সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং তার স্বাধীন বিকাশ রোধ করার চেষ্টা করতেন।

CENTRAL LIBRARY

অপরদিকে, দক্ষিণপন্থীরা বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং জমিদারদের দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত ছিলেন।[৮] সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ-বামের দ্বন্দ্ব উপরোক্ত কারণগুলির জন্যে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা তৈরি করায় শ্রেণীস্বার্থকে কেন্দ্র করে রাজনীতিক দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আকার নেয়।[৯]

কিন্তু যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী শিবির ভেঙে যেতে থাকে। এর কারণ ছিল বহুবিধ। প্রথমত, আন্তর্জাতিক প্রভাব—আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থীদের মধ্যে অপর কিছু অংশের নীতি ও কর্মসূচীতে কি ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন শুরু হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল কিন্তু দোদুল্যচিত্ত নেহরুও এই ঘটনার পর থেকে আরও দৃঢ়ভাবে মিত্রপক্ষের সমর্থক হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে তখনও পর্যন্ত সারা ভারতের জনগণের উপরে এবং এককভাবে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজীর প্রভাব সর্বাধিক ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকে তাঁরা হারাতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা গান্ধীজীর কাছে ছিল সাংঘাতিক বিপদ সংকেত। ফলে তাঁর সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীগোষ্ঠীকে চূড়ান্ত পরাস্ত করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বামপন্থী শিবিরকে সমস্ত সম্ভাব্য পদ্ধতিতে ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘকালীন পদ্ধতি যে যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল বামপন্থী সংহতি কমিটির অবলুপ্তি তার একটি বড় উদাহরণ। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী যে অগস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন মনে হয় তার একটি বড় কারণ ছিল বিদ্রোহাত্মক পরিবেশেও নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখা। কারণ তিনি জানতেন যে গণবিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। আন্দোলনের নেতৃত্ব যাতে গান্ধীজীর হাত থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের নেতাদের হাতে চলে না যায় সে ব্যাপারে তিনি যে সচেষ্ট ছিলেন তা এই আন্দোলনে সুচেতা কৃপালনী প্রমুখের ভূমিকা থেকে আমরা দেখেছি।

তৃতীয়ত, বামপন্থীদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের অভাবও ছিল। বামপন্থী নেতাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা কখনও কখনও বামপন্থী আন্দোলনের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে বলে মনে হয়। কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী চ্যালেঞ্জ গড়ে তোলার জন্য দরকার ছিল গান্ধীজীর পাশাপাশি কোন

CENTRAL LIBRARY

জনপ্রিয় বামপন্থী নেতাকে তুলে ধরা। চতুর্থত, বামপন্থীদের মধ্যে মতাদর্শগত বিভিন্নতা, এমনকি বিরোধ, সংঘাতের রূপ নিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে বিরোধ এর একটি উদাহরণ। অপরদিকে সি. এস. পি-র মধ্যে গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদীদের দ্বন্দ্ব এই দলের সংগঠনের যথেষ্ট ক্ষতি করে। অথচ, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যুগে বামপন্থীদের কর্তব্য ছিল ব্যাপক জনগণের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ন্যূনতম কর্মসূচী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামী ফ্রন্ট গড়ে তোলা। এ কাজে বামপন্থীদের ব্যর্থ হবার একটা বড় কারণ সেকালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বামপন্থী নেতৃদ্বয়ের অন্যতম সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থীদের ঐকবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে না পারা। বামপন্থী হিসেবে খ্যাত অপর জনপ্রিয় নেতা জওহরলাল নিজে কখনো গান্ধীজীর প্রতিযোগী ভূমিকায় যেতে সাহসী হন নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টদের মধ্যে কার্যগত ঐক্য হতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ সেসময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পরমুখাপেক্ষিতা তথা সোভিয়েত ইউনিঅন এবং ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে যান্ত্রিক ভাবে অনুসরণ করা। তাঁরা তখন ভারতের নিজস্ব অবস্থা (specific condition), সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি নিজেদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করার চেষ্টা করেন নি।

বিদেশের মাটিতে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ সংগ্রাম এই পর্বে সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। আমরা আলোচনায় দেখেছি যে এই প্রয়াসের ফলে ভারতে ফ্যাসিস্ত্ আধিপত্য প্রসারিত হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে প্রচার হয়েছিল বাস্তবে ততটা ভয়ের কারণ ছিল না। তবে এই পরীক্ষা যে সামগ্রিকভাবে বিপজ্জনক ছিল সে কথা নেতাজী নিজেও স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর নিজের দিক থেকে যুদ্ধের পুরো সময় বন্দী হয়ে থাকা এবং এই ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে আর কোন পথ খোলা ছিল না।[১০]

সার্বিক বিচারে বলা যায় যুদ্ধপর্বে ভারতের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনতার সংগ্রাম জয়লাভ করতে না পারায় শাসকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ফলত দক্ষিণপন্থীরা, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করেন।[১১] স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামীদের রক্তদানের গুরুত্ব অবশ্য তাতে ম্লান হবার নয়।

তথ্য পঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

১। R. Palme Dutt, *India Today* পৃ ৫৩৮।

২। তদেব, পৃ ৫৪১।

৩। G. N. Curzon, *Problems of the Far East* (1894) থেকে উদ্ধৃত করেছেন R. Palme Dutt, *India Today*, পৃ ৫৪০।

৪। *Eastern Armaments Supplement*, October 19, 1929 থেকে উদ্ধৃত, তদেব, পৃ ৫৪২।

৫। তদেব।

৬। ব্রিটেনের শিল্পায়ন এবং ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠার প্রয়োজনে ভারতকে যেভাবে লুণ্ঠন করা হয় তা কার্ল মার্ক্স তাঁর বহু রচনায় উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য : Karl Marx, *Capital*, Vol. I, পৃপৃ ৪২৪-৫, Karl Marx, *Selected Correspondence*, পৃপৃ ৩১৮, ৩৩৭, অথবা Suniti Kumar Ghosh, *The Indian Big Bourgeoisie* etc. পৃপৃ ২৮-৯।

৭। R. Palme Dutt, *India Today*, পৃ ৫৪৬।

৮। তদেব, পৃ ৫৪৫।

৯। B. R. Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj 1929-1942 : The Penultimate Phase*, Chapter I.

১০। R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement in India*, Vol III, পৃপৃ ৪৬-৯।

১১। তদেব, পৃপৃ ৫০-২।

১২। তদেব, পৃপৃ ২৬-৭।

১৩। যে সমস্ত নেতা অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে গান্ধীজীর উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তাঁদের মধ্যে তিলক ছাড়া চিত্তরঞ্জন দাশ, অ্যানি বেসান্ট, বিপিন চন্দ্র পাল এবং মহম্মদ আলি জিন্নার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তদেব, পৃপৃ ৭৬-৯৮।

CENTRAL LIBRARY

১৪। তদেব, পৃপৃ ১৫৫-৬০।

১৫। B. R. Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj* etc., পৃপৃ ১৮, ২১।

R. Palme Dutt, *India Today*, Part II, Chapter VI.।

১৬। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩১৭।

Nimai Pramanik, *Gandhi and the Indian National Revolutionaries*, পৃ ১০৫।

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজি এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বামপন্থী ও বিপ্লবীদের মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে Nimai Pramanik, তদেব, পৃপৃ ৯৪-১০৬ এবং Buddhadeva Bhattacharya (ed), *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*, Vol. I, পৃপৃ ২৩১-৯ দ্রষ্টব্য।

১৭। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ১৯২৮ সাল থেকে কৃষক ও শ্রমিক দল গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ভূমিকা নেয় এবং কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেয়। ত্রিশ দশকের প্রথম থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষক সম্মেলন এবং সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। (ক) আবদুল্লাহ রসুল, **কৃষক সভার ইতিহাস**, পৃপৃ ৫১, ৫৯-৬০ [বইটির ১৯৮০ সালের যে সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ভুলবশত কয়েকটী পৃষ্ঠায় একই নম্বর দুবার ছাপা হয়েছে। ফলে ৫১ পৃষ্ঠা দুবার পাওয়া যাবে। সেইজন্যে এক্ষেত্রে সূচীপত্রে যেভাবে পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া আছে তাকে অনুসরণ করা হয়েছে।] (খ) R. Palme Dutt, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৩৮২-৪৩৫, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ ও সমাজবাদী চিন্তার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে একটি সামগ্রিক সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে।

১৮। Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle* : 1920-42, পৃ ৩৫৭।

১৯। সি. এস. পি.-র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য Asim Kumar Chaudhuri, *Socialist Movement in India*, পৃপৃ ৩০-৪৯। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য R. Palme Dutt, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৫২৫-৩০

এবং Subhas Chandra Bose, "The Pros and Cons of Office Acceptance", *Crossroads*, পৃপৃ ৫৬-৬৪।

২০। Kali Charan Ghosh, *The Roll of Honour : Anecdotes of Indian Martyrs*, পৃপৃ ২৪৬-৩৪৪, ৪২২-৩, ৪৬৩-৯।

২১। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৭৯।

২২। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, পৃপৃ ১৭-২১। সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন, "More important than the question of the proper working of the Congress Governments is the immediate problem of how to oppose the inauguration of the federal part of the Constitution...." [তদেব, পৃ ১৭]।

ঐ ভাষণেই তিনি বলেন : "We have to fight Federation by all legitimate and peaceful means—not merely along constitutional lines—and in the last resort, we may have to resort to mass civil disobedience which is the ultimate sanction we have in our hands,..." [তদেব, পৃ ২১]।

২৩। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৫৭৯-৮০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা, পৃপৃ ৮৫-৬। কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচন সংক্রান্ত বিবৃতিগুলির জন্যে পৃপৃ ৮৭-১০৪ দ্রষ্টব্য।

২। Nripendra Nath Mitra (ed.), *Indian Annual Register*, 1939, Vol. I, Jan-June।

৩। Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১০৫-৬। স্থানাভাববশত এই বইতে সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা বিস্তারিত করা অথবা বিবৃতিগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভবপর হল না।

৪। R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, পৃ ৫৯৬।

৫। B. R. Tomlinson, *The Indian National Congress and the Raj* etc, পৃ ১৪৪।

৬। তদেব।

৭। তদেব।

৮। Francis G. Hutchins, *Spontaneous Revolution : The Quit India Movement*, পৃপৃ ১৮৬-৭।

৯। জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 3/16/40 Poll (1), তদেব, পৃ ১৮৯।

১০। ১৯৪০ সালের ২৫ এপ্রিল ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক ভাইসরয়ের একান্ত সচিবকে প্রেরিত পত্র। জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 3/13/40/ Poll (1), তদেব, পৃ ১৯০।

১১। জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 6/8/40/Poll (1), তদেব, পৃ ১৯২।

১২। ১৯৪১ সালের ২৩ এপ্রিল ভাইসরয়ের কাছে উত্তর প্রদেশের গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট নং, UP 92, জাতীয় মহাফেজখানা, স্বরাষ্ট্র ফাইল নং, 3/31/40/Poll (1), তদেব, পৃ ১৯৩, এবং পৃ ১৯৫। স্যার হ্যালেটের নিজের ভাষায় : "…if we are out to smash the Congress as a political party in the country, we alienate all the support we might get from its half-hearted supporters. I do not question the desirability of smashing the Congress but I submit that this is not the way to do it. …Having said that the future Constitution of India will, subject to certain safeguard, be decided by Indians themselves, it seems anomalous for us to go out and smash the Congress on any other ground but they are interfering in the war." [পৃ ১৯৩]।

১৩। "I am not just now thinking of India's deliv-

erance. It will come, but what will it be worth if England and France fall, or if they come out victorious over Germany ruined and humbled?"—Gandhiji in *Harijan*, 9 Sept, 1939, R. C. Majumder, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৯৭।

১৪। "We do not approach the problem with a view to taking advantage of Britain's difficulties.···In a conflict between democracy and freedom on the one side and Fascism and aggression on the other, our sympathies must inevitably lie on the side of democracy....I should like India to play her full part and throw all her resources into the struggle for a new order."—J. L. Nehru in *The Statesman*, 10 Sept. 1939, তদেব।

১৫। B. R. Tomlinson, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৪৩।

১৬। Nripendra Nath Mitra (ed), পূর্বোল্লিখিত, Vol. II, পৃপৃ ২২৬-৮।

১৭। তদেব, পৃ ২৩১।

১৮। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৯৯।

১৯। R. C. Majumdar, তদেব, পৃ ৫৯৮।
Francis G. Hutchins, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৮৭।

২০। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫৭২।

২১। Francis G. Hutchins, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৮৬।

২২। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬০১।

২৩। তদেব।

২৪। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ ৩৪।

২৫। তদেব।

২৬। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬০২।

২৭। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৪।

সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনায় ১৯৩০ সালের ২৭ এবং ২৮ জুলাই ১৮৮ জন সদস্যের উপস্থিতিতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে বলে এই বইতে বলা

হয়েছে তার প্রথমে বর্ণিত প্রস্তাবটি ১৯৪০ সালের ২১ জুন গৃহীত ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটির প্রস্তাবের অনুমোদন। দ্বিতীয় যে প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে তা হল রাজনীতিক অবস্থা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব। এটি ১৯৪০ সালের ৭ জুলাই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ওআর্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত হয় এবং এ. আই. সি. সি.-র উপরে উল্লিখিত সভায় অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ বয়ানের জন্যে Nripendra Nath Mitra (ed), পূর্বোল্লিখিত, 1940, Vol II, পৃপৃ ১৭৬-৭, ১৯৫ দ্রষ্টব্য।

২৮। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫।

২৯। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬০৬।

"Viceroy's offer of Enlarged Executive" যা 'অগস্ট প্রস্তাব' নামে পরিচিত তার পূর্ণাঙ্গ বয়ানের জন্যে দ্রষ্টব্য Nripendra Nath Mitra (ed), পূর্বোল্লিখিত, 1940, Vol II, পৃপৃ ৩৭২-৩।

৩০। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৬।

৩১। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৮৩।

৩২। B. R. Tomlinson, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৫১।

৩৩। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৭।

৩৪। B. R. Tomlinson, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১৫২।

৩৫। তদেব, পৃ ১৫১।

৩৬। তদেব, পৃপৃ ১৫১-২।

৩৭। তদেব, পৃ ১৫২।

৩৮। তদেব।

৩৯। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৩৯-৪০।

৪০। তদেব, পৃ ৪৬।

৪১। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ যে খসড়া ঘোষণা (Draft Declaration) ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করেন তার জন্য তদেব, পৃপৃ ২২৮-৯ (Appendix-1) দ্রষ্টব্য॥

৪২। নেতাজী কর্তৃক আজাদ হিন্দ্‌ রেডিয়ো, জার্মানী থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৪২-এ প্রচারিত বেতার ভাষণ। Subhas Chandra Bose, *Selected Speeches*, পৃপৃ ১৩১-৪।

৪৩। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫ ।

৪৪। তদেব, পৃপৃ ৫০-১।

৪৫। তদেব, পৃপৃ ৬৪-৫।

তৃতীয় অধ্যায়

১। Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle, 1920-42*, পৃ ৩৩৩।

২। তদেব, পৃ ৩৩৭।

৩। তদেব, পৃপৃ ৩৩৯-৪০।

৪। তদেব, পৃপৃ ৩৪০-১।

৫। L. P. Sinha, *The Left Wing in India, 1919-1947*, পৃ ৪৯২।

৬। Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৪১।

৭। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯২।

৮। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, পৃ ২৪৪।

৯। তদেব, পৃ ২২২।

১০। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত পৃ ৪৯৩।

১১। Subhas Chandra Bose, *Crossroads*, পৃ ২৪৪।

১২। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯৩।

১৩। Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle*, পৃ ৪০৫।

১৪। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯৪।
Subhas Chandra Bose, *The Indian Struggle*, পৃ ৪০৫।

১৫। তদেব, পৃ ৩৪৪।

১৬। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৪৯৫।

১৭। তদেব, পৃ ৪৯৬।

১৮। *World News and Views*, June 28, 1940-তে প্রকাশিত B. Asche-এর প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৪৯৭-৮।

১৯। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৪৯৫-৬।

২০। তদেব, পৃপৃ ৫০১-২।

২১। তদেব, পৃপৃ ৪৯৯-৫০০।

২২। সি. এস. পি. ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সংক্রান্ত আলোচনার (এই বইয়ের পৃপৃ ৪০-৬) সমস্ত তথ্যের সূত্র L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৫০২-১১।

চতুর্থ অধ্যায়

১। L. P. Sinha, *The Left Wing in India, 1919-1947*, পৃ ৫১৩।

২। তদেব, পৃপৃ ৫১৫, ৫১৭, ৫১৯-২০, ৫২২।

৩। তদেব।

M. R. Masani, *The Communist Party of India*, পৃপৃ ৮০-৬।

৪। সি. পি. আই-এর দলিল—

Hiren Mukherjee, *Our Freedom Struggle and the Communist Party, Some Reflections and Observations*।

Dilip Basu, Foreword by C.Rajeswara Rao, *1942 August Struggle and the Communist Party of India*।

Goutam Chattopadhyay, *Arun Shourie's Slander Rebutted, History Has Vindicated the Communists*।

৫। সি. পি. আই (এম)-এর দলিল—

M. Basavpunnaiah, *Quit India Call and the Role of Communists* (A Reply to Arun Shourie)।

৬। আর. এস. পি.-র দলিল—

R. S. P. *On Russo-German War*, পৃ ১৮।

৭। আর. সি. পি. আই-র দলিল—

Polit Bureau, C.C., R. C. P. I. (ed),

Historical Development of Communist Movement in India, পৃপৃ ৩৫-৪৪।

Saumyendra Nath Tagore, *Sahajanand. Kornilov and People's War*।

পঞ্চম অধ্যায়

১। R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, পৃ ৬৩৪।

২। তদেব, পৃ ৬৩৫।

৩। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ ৭২।

৪। কংগ্রেস ওআর্কিং কমিটি ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই যে প্রস্তাব গ্রহণ করে স্থানাভাববশত এখানে সেই মূল প্রস্তাবটি তুলে দেওয়া সম্ভবপর হল না। ওই প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ানের জন্যে তদেব, পৃপৃ ৭৭-৯ দ্রষ্টব্য।

৫। Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, পৃ ৩১০।

৬। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৮০-১।

৭। তদেব, পৃ ৮১।

৮। "Everyone of you should from this moment onward consider yourself a freeman or woman and act as if you are free···. I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom···. We shall do or die. We shall either free India or die in the attempt."—Gandhiji

R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৪৪। এছাড়া Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫১ এবং Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৮২-৩ দ্রষ্টব্য।

৯। Abul Kalam Azad, তদেব, পৃপৃ ৮৩-৭ দ্রষ্টব্য।

১০। Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৩১০-১।

১১। L. P. Sinha, *The Left Wing in India*, পৃপৃ ৫২০-১।

১২। তদেব, পৃপৃ ৫২২-৩।

১৩। তদেব, পৃপৃ ৫২৫-৭।

১৪। Arun Chandra Bhuyan, *The Quit Innia Movement : The Second World War and Indian Nationalism*, পৃ ১০৪।

১৫। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১৯।

১৬। Arun Chandra Bhuyan, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১১১-২।

১৭। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫১৯।

১৮। Subhas Chandra Bose, *Selected Speeches*, পৃপৃ ১৫১-২।

১৯। Buddhadeva Bhattacharya, *Origins of the RSP : From National Revolutionary Politics to Non-conformist Marxism*, পৃ ৪৮। বিশদ আলোচনার জন্যে পুরো পুস্তিকাটি দ্রষ্টব্য।

২০। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৫২ ।

২১। তদেব, পৃ ৫২৮।

২২। Polit-Bureau, C. C, R. C. P. I. (ed.), *Historical Development of Communist Movement in India*, পৃ ৬৩।

২৩। L. P. Sinha, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৫২৮-৩০।

২৪। আগস্ট আন্দোলনের শিক্ষা।

২৫। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৬৭৯-৮১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। A. Moin. Zaidi, *The Way Out to Freedom : An Enquiry into the Quit India Movement Conducted by Participants*, পৃ ৯।

২। Arun Chandra Bhuyan. *The Quit India Movement etc.* পৃপৃ ১০৬-৭।

৩। তদেব, পৃ ১১১।

৪। A. Moin Zaidi, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১।

৫। তদেব, পৃপৃ ১৫-৮।

৬। তদেব, পৃ ২১।

৭। Govind Sahai, '42 *Rebellion etc.*, পৃপৃ ১৪৭-৮, ২২৩, ২৭৮-৯।

R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement in India*, Vol. III, পৃপৃ ৬৫৩-৭।

৮। Govind Sahai, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৭৫।

৯। তদেব, পৃপৃ ২৭৫-৯৫।

১০। তদেব, পৃপৃ ২৭৪, ২৯৫, ৩০০।

R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৬৭৮-৮০।

১১। A. Moin Zaidi, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৩৫।

১২। Francis G. Hutchins, *Spontaneous Revolution* etc. পৃ ২১৫।

১৩। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৫৭।

১৪। তদেব, পৃ ৬৫৮।

১৫। সে যুগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ অনেকাংশেই অন্তর্ভূত ছিল।

১৬। কংগ্রেস রিপোর্ট দ্রষ্টব্য, A. Moin Zaidi, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ২৬-৮।

১৭। তদেব, পৃপৃ ৩-৪।

১৮। Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, পৃ ৯০।

১৯। তদেব, পৃপৃ ৪১, ৭৪, ৮২, ৮৫।

২০। P. N. Chopra (ed.), *Quit India Movement etc.* পৃপৃ ৫-৭, ১০।

২১। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯২।

২২। তদেব, পৃ ৯৩।

২৩। R. C. Majumdar, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৯৫।

২৪। Abul Kalam Azad, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৯৩-৪।

২৫। তদেব, পৃ ৯৪।

২৬। Arun Chandra Bhuyan, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৩৩-৪৩।

আন্দোলন পরিচালক গোষ্ঠির মতবিরোধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এইখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

১। N. G. Ganpuley, *Netaji in Germany, A Little Known Chapter*, পৃপৃ ১৭৫-৭।

Hugh Toye, *Subhas Chandra Bose, The Springing Tiger- A Study of a Revolution*, পৃপৃ ৫৯-৬১।

২। N. G Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃ XIX।

৩। তদেব, পৃপৃ ১৯-২০।

৪। তদেব, পৃপৃ ২৮-৯।

৫। তদেব, পৃপৃ ১৯-২৭।

৬। তদেব, পৃপৃ ৪১-২।

৭। তদেব, পৃপৃ ৪৭-৫৩।

৮। Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৬৪।

৯। N. G. Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃ IX।

১০। তদেব, পৃপৃ ৭০-১।

১১। তদেব, পৃ ৭৩।

১২। তদেব, পৃ ৭৮।

১৩। তদেব, পৃ ৮৩। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৭০-১।

১৪। N. G. Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১১০-৬, ১২২।

১৫। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৬৭-৯।
N. G. Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১২৩-৪।

১৬। তদেব, পৃপৃ ১২৪, ১৩৮-৯।
Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৭৯।

নেতাজী পূর্ব এশিআয় রওনা হবার পরে ইওরোপে অবস্থিত আজাদ হিন্দ

CENTRAL LIBRARY

ফৌজ হল্যাণ্ড থেকে বেলজিয়াম হয়ে ফ্রান্সের বোর্জের অঞ্চলে পৌঁছয়। ফ্রান্সের লাকানোর গ্রামাঞ্চলে এই বাহিনী বহু দিন থাকে। মাত্র যুদ্ধের শেষ পর্বে ১৯৪৪ সালের ১৫ অগস্ট বাহিনীকে জার্মানীতে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হয়। পথে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বহুবার গেরিলা আক্রমণের মোকাবিলা করে এবং ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ জার্মানির হিউবার্গ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে। ১৯৪৫ সালের ৭ মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ফরাসী ও আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর কাছে ইওরোপের বিভিন্ন জায়গায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। N. G. Ganpuley, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৫৫-৭০।

১৭। A.C. Chatterjee, *India's Struggle for Freedom*, পৃ ৫০।

১৮। তদেব, পৃপৃ ৭১-৬।

১৯। তদেব, পৃপৃ ৭৬-৮০।

২০। তদেব, পৃপৃ ৮৫-৯১।

২১। তদেব, পৃপৃ ৯১-৯৬, ১০৩।

২২। তদেব, পৃপৃ ১০৮-১১।

২৩। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৮৫।

২৪। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ১১০।

২৫। তদেব, পৃপৃ ১২৪-৮।

ঝাঁসি রাণী বাহিনীর লেঃ জোসেফাইন, হাবিলদার স্টেলা প্রমুখ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যাবর্তনের সময়ে রেঙ্গুন থেকে ব্যাংককের পথে শত্রুর সঙ্গে লড়াই-এ ১৯৪৫ সালের ৩ এপ্রিল আত্মদান করে শহীদ হন।

২৬। Hugh Toye, পূর্বে লিখিত, পৃ ৮৬।

২৭। তদেব, পৃ ৯০।

২৮। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৩৩-৮।

২৯। তদেব, ১৩৯-৪০।

৩০। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৩।

৩১। A. C. Chatterjee, পৃপৃ ১৪১-৭।

৩২। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৭।

৩৩। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৪৭-৮।

৩৪। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৭।

CENTRAL LIBRARY

৩৫। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৫৪, ১৬০-১।

৩৬। তদেব, পৃ ১৫০।

৩৭। তদেব, পৃ ১৫১।

৩৮। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯৮।

৩৯। A. C. Chatterjee, পৃ ১৫৫।

৪০। তদেব, পৃপৃ ১৫৬-৫৭, ৫৯, ১৬৪।

৪১। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ৯২।

৪২। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৬৬, ১৭১-২।

৪৩। তদেব, পৃপৃ ১৬২, ১৬৪-৫, ১৭৫।

৪৪। তদেব, পৃপৃ ১৭৬-৯০।

৪৫। তদেব, পৃপৃ ২০৮—১০।

৪৬। তদেব, পৃপৃ ২১১-২, ২২৬।

৪৭। তদেব, পৃপৃ ২৪০-৫।

৪৮। তদেব, পৃপৃ ২৫৩-৫।

৪৯। তদেব, পৃ ২৫৬।

৫০। তদেব, পৃপৃ ২১৮, ২৫৯-৬০, ২৬৪, ২৭৭, ২৮২। এছাড়া দ্রষ্টব্য ১৯৪৫ সালের ২১ মে ব্যাংককে নেতাজী প্রদত্ত বক্তৃতা। Subhas Chandra Bose, *Selected Speeches*, পৃপৃ ২২৮-৯।

৫১। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৬৪।

৫২। তদেব, পৃপৃ ২৬৮-৭১।

৫৩। তদেব, পৃপৃ ২৭১-৮৭।

৫৪। তদেব, পৃপৃ ২৯২, ৩১৩।

ভারতীয় রাজকীয় নৌবাহিনী (Royal Indian Navy)-র রেটিংদের বিদ্রোহ [ডিসেম্বর, ১৯৪৫—ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬] সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার জন্যে B.C. Dutt, *Mutiny of the Innocents* বই-এর পৃপৃ ৭৪-১৯৯ দ্রষ্টব্য।

৫৫। A. C. Chatterjee, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ২৯৭ ৩০৮।

৫৬। তদেব, পৃ ৩১২।

৫৭। তদেব, পৃ ৩১১।

৫৮। তদেব, পৃ ৩১৩।

৫৯। Hugh Toye, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ১৭০-৭৫।

R. C. Majumdar, *History of Freedom Movement in India* Vol, III, পৃপৃ৭৪৮-৫৩।

অষ্টম অধ্যায়

১। C. F. Andrews and Mukhejee, The Rise and Growth of the Congress, 1938.

২। A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, পৃপৃ ২০০-৬।

Sumit Sarker, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, পৃপৃ ১০৮-৪৮।

Aditya Mukherjee, "Indian Capitalist Class and Congress on National Planning and Public Sector, 1930-47" in K. N. Panikkar (ed.), *National and Left Movements in India*, পৃপৃ ৪৫-৭৯।

৩। R. P. Dutt, *India Today*, Chapter XII "Rise of Labour and Socialism" দ্রষ্টব্য, পৃপৃ ৩৮২-৪৩৫।

A. R. Desai, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ২১০-৪।

৪। তদেব, পৃ ১৮৪।

৫। Partha Chatterjee, *Agrarian Relations and Politcs in Bengal : Some Considerations on the Making of the Tenancy Act Amendment, 1928*, পৃপৃ ২১-৩৫ উদাহরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য।

৬। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এ ব্যাপারে দ্রষ্টব্য।

A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggle in India*, "Agrarian Struggles in the 19th Cenutry," Part II, পৃপৃ ১২৯-২০৩ অংশ দ্রষ্টব্য।

৭। A. R. Desai, *Social Background* etc. পৃপৃ ১৮৭-৮।
আবদুল্লাহ রসুল, **কৃষক সভার ইতিহাস**, পৃপৃ ৫৭-৬৭।
D. N. Dhanagare, "The Politics of Survival: Peasant Organisations and Left Wing in India, 1925-46", in K. N. Panikkar (ed.), পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৮০-১০৪।

৮। A. R. Desai (ed.), *Peasant Struggle* etc., Part V, Introduction, পৃপৃ ৪১৫-২৭।
Aditya Mukherjee, পূর্বোল্লিখিত, বিশেষত Sect. II এবং III, পৃপৃ ৫৯-৭৯ দ্রষ্টব্য।
Sumit Sarkar, *Modern India, 1885-1947*, পৃপৃ ৩৫৮-৬১।

৯। R. P. Dutt, পূর্বোল্লিখিত, Chapter XI, "Three Stages of National Struggle," পৃপৃ ৩১৯-৮১।
Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, পৃ ৩২৯।

১০। ১৯৪৪ সালের ৬ জুলাই আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে প্রচারিত এবং ১৮ জুন ১৯৪৫-এ সিঙ্গাপুর রেডিও থেকে প্রচারিত যথাক্রমে গান্ধীজী এবং দেশবাসীর উদ্দেশে নেতাজীর বেতার ভাষণ দুটির উল্লেখ এ ব্যাপারে করা যেতে পারে। A. C. Chatterjee, *Indian Struggle for Freedom*, পৃপৃ. ২১৬-২৫, ২৭১-৪।
Subhas Chandra Bose, পূর্বোল্লিখিত, পৃপৃ ৩৪৫-৬।

১১। Abul Kalam Azad, "The Prelude to Partition," "The Interim Governent", "The Mountbatten Mission," "The End of a Dream' প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য, *India Wins Freedom*, পৃপৃ ১৫২-২০৫।
V. P. Menon, *The Transfer of Power in India*, Chapters 15-18 এবং Appendix 11 : "The Indian Independence Act, 1947" ও Appendix 12 : "Congress Comments on the Draft Indian Indepedence Bill" দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ পঞ্জী

লেখকের পদবীর আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। বাংলা বইগুলির বিবরণ বাংলা অক্ষরে দেওয়া হয়েছে।

Andrews, C. F. and Mookerji, Girija : The Rise and Growth of the Congress, 1938, Allen and Unwin, London.

Azad, Maulana Abul Kalam : *India Wins Freedom, An Autobiographical Narrative*, Sangam Books, New Delhi, 1978.

Basavpunnaiah, M : *Quit India Call and the Role of Communists (A reply to Arun Shourie)*, National Book Centre, New Delhi, 1984.

Basu, Dilip : *1942 August Struggle and the Communist Party of India*, Communist Party Publication, No. 8, New Delhi, June 1984.

আগষ্ট আন্দোলনের শিক্ষা, দুলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৯৪৬।

Bhuyan, Arun Chandra : *The Quit India Movement, The Second World War and Indian Nationalism*, Manas Publiations, New Delhi, 1975.

Bhattacharya, Buddhadeva (ed.) : *Freedom Struggle and Anushilan Samiti*, Vol. I, Anushilan Samiti, Calcutta, 1979.

——— : *Origins of the RSP, From National Revolutionary Politics to Non-Conformist Marxism*, Publicity Concern, Calcutta, November, 1982.

Bose, Subhas Chandra : *The Indian Struggle, 1920-42*, Asia Publishing House, Bombay, 1964.

———: *Crossroads*, Asia Publishing House, Bombay, 1962.

————: *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, Publications Division, Delhi, October, 1962.

Communist Party of India (CPI): *Party Letter*, No. 44, September-October, 1941.

Chopra, P. N. (ed.): *Quit India Movement, British Secret Report*, Thomson Press (India) Ltd, Faridabad, 1976.

Chatterji, Maj-Gen. A. C: *India's Struggle for Freedom*, Chuckervertty, Chatterjee and Co. Calcutta, 1947.

Chatterjee, Partha: *Agrarian Relations and Politics in Bengal, Some Considerations on the Making of the Tenancy Act Amendment, 1928*, (Mimeo), Occasional Paper No. 30, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, 1980.

Chattopadhyay, Goutam: *Arun Shourie's Slander Rebutted. History has vindicated the Communists*, Communist Party Publication, No. 9., New Delhi, June, 1984.

Choudhuri, Asim Kumar: *Socialist Movement in India, The Congress Socialist Party* (1934-1947), Progressive Publishers, Calcutta, March, 1980.

Dutt, B. C.: *Mutiny of the Innocents*, Sindhu Publications Pvt. Ltd., Bombay, 1971.

Dutt, R. Palme: *India Today*, Manisha Granthalaya, Calcutta, 1970 (2nd ed.)

Desai, A. R.: *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Prakashan, Bombay, 1981 (reprint).

————(ed), *Peasant Struggle in India*, Oxford University Press, Delhi, 1979.

Ghosh, Suniti Kumar: *The Indian Big Bourgeoisie, Its*

Genesis, Growth and Character, Subarnarekha, Calcutta, 1985.

Ghosh, Kali Charan : *The Roll of Honour, Anecdotes of Indian Martyrs*, Vidya Bharati, Calcutta, April, 1965.

Ganpuley, N. G. : *Netaji in Germany, A Little Known Chapter*, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1959.

Hutchins, Francis G.: *Spontaneous Revolution* : The *Quit India Movement*, Manohar, Delhi, 1971.

Marx, Karl : *Capital*, Vol. I. Progress publishers, Moscow, 1974 (reprint).

————: *Selected Correspondence*, Progress Publishers, Moscow, 1965.

Majumdar, R. C. : *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1963.

Mitra, Nripendra Nath (ed) : *Indian Annual Register*, Vols. I & II, 1939 and Vol. II, 1940, Calcutta.

Masani, M. R. : *The Communist Party of India, A Short History*, Derek Verschoyle, London, 1954.

Menon, V. P. : *The Transfer of Power in India*, Orient Longman, Bombay, 1957.

Mukherjee, Hiren : *Our Freedom Struggle and the Communist Party, Some Reflections and Observations*, Communist Party Publication, No. 2., New Delhi, January, 1984.

Panikkar, K. N. (ed.) : *National and Left Movement in India*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980.

Pramanik, Nimai : *Gandhi and the Indian National Revolutionaries*, Sribhumi Publishing Co , Calcutta, 1984.

রসুল, আবদুল্লাহ : কৃষকসভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, জুলাই ১৯৮০ (২য় সংস্করণ) ।

রায়, সুপ্রকাশ : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, ডি. এন. বি. এ., কলকাতা, ১৯৮০ (৩য় সংস্করণ)।

R. C. P. I. Polit Bureau, C. C. (ed.) : *Historical Development of Communist Movement in India*, n. d.

R. S. P. : **On Russo-German War**

Sinha L. P. : *The Left Wing in India, 1919-1947*, New Publishers, Muzaffarpur, 1965.

Sahai, Govind : *'42 Rebellion (An Authentic Review of the Great Upheaval of 1942)*, Rajkamal Publications, Delhi, 1947.

Sarkar, Sumit : *The Swadeshi Movement in Bengal,1903-1908*, People's Publishing House, New Delhi, 1977 (reprint).

————: *Modern India 1885-1947*, Macmillan, New Delhi, 1983.

Tagore, Saumyendranath : *Sahajanand, Kornilov and People's War*, n. d.

Tomlinson, B. R. : *The Indian National Congress and The Raj, 1929-1942 : The Penultimate Phase*, Macmillan, London, 1976.

Toye, Hugh : *Subhas Chandra Bose, The Springing Tiger, —A Study of a Revolution*, Jaico Publishing House, Bombay, 1978.

Zaidi, A. Moin : *The Way out to Freedom : An Enquiry into the Quit India Movement Conducted by Participants*, Orientalia, New Delhi, 1973.

CENTRAL LIBRARY

নির্দেশিকা

অজয় মুখোপাধ্যায় ৭১
অমর সিং ১০২
অশোক মেহতা ৮
অজায়েব সিং ১০৩
অরুণা আসফ আলী ৬০, ৭৯
অ্যামেরি ৬৫
অচ্যুত পট্টবর্ধন ৮, ৬০, ৬১, ৭৯

আকবর আলী শাহ্
মেজর (ডঃ) ১০৩
আরউইন, লর্ড ৭
আলওয়াই, মেজর ৯৯
আসফ আলী ৫৭, ৭৬
আয়ার, এস. এ ৯৪, ১০৭
আজিজ আমেদ খান ৯৪
আমেদ, বশির ৯৮
আমেদ, মেহবুব (মেজর) ১০২
(মৌলানা) আবুল কালাম আজাদ
১১, ১৮, ২১, ২২-২৪, ২৬,
৩০, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭,
৭৫-৭৭
(খান) আব্দুল গফুর খান ২২

ইকবাল, মহম্মদ ২০
ইশান কাদির ৯৫
ইয়ামামোতো, কর্ণেল ৮৮
ইয়ামাশিটা, জেনারেল ১০৮
ইয়েলাপ্পা, এ ৯৫

ঈশ্বর সিং ৯৫

এ. এন. সরকার ৯৫
এ. সি. চ্যাটার্জী ৯৪, ৯৬, ১০৭
এল. পি. সিন্‌হা ৪৩

ওশিমা ৮৮

করিম গণি ৯৫
কাও আবে,
লেঃ জেনারেল ১০০, ১০৮
কিয়ানী, মহম্মদ জামান,
লেঃ কর্ণেল ৯২, ৯৫, ৯৯
কোইসো, জেনারেল ১০৫
কর্ণওআলিস, লর্ড ১১৩
কর্তার, সিং ৮
(আচার্য) কৃপালনী, জে. বি. ১১,
১৮, ২২, ২৫, ৭৬
কৃপালনী, সুচেতা ৬১, ৭৮,
৭৯, ১১৫
ক্রিপ্‌স্, স্টাফোর্ড, স্যার ২৬-২৯

থাকার, বিঠলদাস (বাবুভাই) ৬৫
খান, ডি. এম ৯৫

CENTRAL LIBRARY

গিলানী, জি. কিউ ৯০
গুলজারা সিং ৯৫
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৫০, ৫১
গান্ধী, দেবদাস ৭৪
গান্ধী, মহাত্মা ৪, ৫, ৭-১১, ১৭, ১৯, ২১-২৮, ৩১, ৪২, ৫৩-৫৫, ৫৭, ৭৪-৭৮, ১১৬

চার্চিল, উইনস্টন ৩, ১৩
চিত্তরঞ্জন দাশ ৪
চেম্‌সকোর্ড ৫

জওহরলাল নেহরু ৭, ১০, ১১, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৭-২৯, ৩২, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৬১, ৭৩, ৭৬, ৭৯, ১০৭, ১১৬
জয়প্রকাশ নারায়ণ ৮, ৪৩, ৬৬
জাহাঙ্গীর, কর্ণেল ৯২
জিন্না, মহম্মদ আলী ১৯, ২০, ২৫, ৩৫, ৬৩, ৭৭

টমলিনসন, বি. আর ১৩
টয়, হিউ ৯৭, ১১২
টোটেনহ্যাম ৭৫
টোয়াইনাস, স্তর ৭৬

ডায়ার, জেনারেল ৫
ডি. এন. ভাদুড়ী ১০৪

তিলক, বালগঙ্গাধর ৪
তোজো, হিদেকি ৯০, ৯৮, ১০৮
তোয়ামা ৮৯
তেরাউচি, কাউন্ট, ফিল্ড মার্শাল ৯৪

থাপা, কুলবীর, ক্যাপ্টেন ৯২
থিবি, জে ৯৫
থিমাইয়া, কে. পি., লেঃ কর্ণেল ৯২

দলপতি সিং ১০২
দিলীপ বসু ৫০, ৫১
দীনেশ গুপ্ত ৯
দেবনাথ দাস ৯৫
দৌলতরাম, জয়রাম দাস ১১, ১৮
দত্ত, রজনী পাম ৪৮

ধিলোঁ, জি. এস., লেঃ কর্ণেল ১০৭

(আচার্য) নরেন্দ্র দেব ৮, ১৮, ৪৩
নাম্বিয়ার, এ. সি. এন ৮৫
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ৬০
নিজামী ৯৮

পলিট, হ্যারি ৪৮
পিয়ারীলাল ৭৬
পিংলে ৮
প্যাটেল, দয়াভাই ৬৫
প্যাটেল, ভি. জে ৮
প্রফুল্ল ঘোষ ১৮

CENTRAL LIBRARY

প্রীতম সিং, মেজর ১০৩

ফুজিওআরা, মেজর ৮৯, ১০৮

বা ম, ডঃ ৯৯, ১০৬
বাজাজ, যমুনালাল ১১
বাদল গুপ্ত ৯
বাসবপুন্নিয়া, এম ৫০-৫২
বি. ঘোষ ৯৭
বিনয় বসু ৯
বিনোবা ভাবে ২৪
(শ্রীমতী) বেতাই ৯৭
বক্স, খান বাহাদুর আল্লা ২৮
বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার ১১, ১৮
২১, ২২, ৫৫, ৫৭, ৭৯

ভগত, এন. এস., লেঃ কর্ণেল ৯২, ৯৫
ভুলাভাই দেশাই ১১, ২৬, ৫৭
ভোঁসলে, জে. কে., লেঃ কর্ণেল
৯১, ৯৫

মতিলাল নেহরু ৭
মনসুখলাল, লেঃ ১০৩
মহম্মদ আলী ৫
মহাদেব দেশাই ৫৬
মগ্‌গর সিং, ক্যাপ্টেন ১০২
মানবেন্দ্রনাথ রায় ৩২, ৩৪, ৪৪, ৪৫
মালহোত্রা, উত্তমচাঁদ ৮২
মালিক, কর্ণেল ১০৩
মিস্থ মাসানী ৮
মীরা বেন (মিস্ স্লেড) ৫৫, ৫৬
মিশ্র, লেঃ কর্ণেল ১০১
মেনন, কে. পি. কে ৯০
মেহর দাস, মেজর ১০১
মেহের আলী, ইউসুফ ৮, ৪১
মোতাগুচি, লেঃ জেনারেল ১০৮
মোহন সিং, ক্যাপ্টেন ৮৯, ৯০, ১০৭
মণ্টেগু ৪
ম্যাক্সওয়েল, রেজিনাল্ড, স্যর ১৫

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮
যোগেশ চ্যাটার্জী ৬২
যোশী, পি, সি ৪৯

রমেশচন্দ্র মজুমদার ২২, ১১২
রলিনসন, লর্ড ২
রহমান, হবিবুর ১০৭
রাও, ক্যাপ্টেন ১০৩
রাওয়াত, বি. এস ৯২
রাওলাট ৫
রাজেন্দ্র প্রসাদ ১১, ২২, ৫৭
রামমনোহর লোহিয়া ৪৩, ৬০, ৬১,
৬৫, ৭৯
রাসবিহারী বসু ৮, ৯, ৮৭-৯০, ৯৩,
৯৫
রাজাগোপালাচারী, চক্রবর্তী ১৮, ২২,
২৬-৩০
রাতুরি, মেজর ১০১
রিজভি, ক্যাপ্টেন ৯২

লাল সিং, লেঃ ১০৩
লালা হরদয়াল ৮
লিনলিথগো, লর্ড ১২, ১৮, ২২, ৭৬
লোগনাথন, এ. ডি., লেঃ কর্ণেল ৯২, ৯৫, ৯৯

শমশের সিং ৯২
শাহ্‌নওয়াজ খান ৯২, ৯৫, ১০৭
শিগেমেৎসু, মোমোরু ১০৫
শঙ্কর রাও দেও ১১, ২২, ৭৬
(স্বামী) সহজানন্দ সরস্বতী ৩৫
সতীশচন্দ্র সামন্ত ৭১
সহায়, এ. এম ৯৫
সরোজিনী নাইডু ৫৭
সাইমন, জন ৭
সাদিক আলী ৭৮
সাধু সিং, ক্যাপ্টেন ১০৩
সাহ, এম. সি. ৭১
সীতারামাইয়া, পট্টভি ১১, ১২
সুগিয়ামা, জেনারেল ৯৯
সুভাষচন্দ্র বসু ৭-১২, ২২, ২৬, ২৭, ৩২-৩৬, ৩৮, ৫৫, ৬১, ৬২, ৮১-৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৮-১০০, ১০২, ১০৪, ১০৬-১০৮, ১১৬
সুশীল ধাড়া ৭১
সুরযমল, ক্যাপ্টেন ১০১
সূর্য সেন (মাস্টারদা) ৮
সেদাই, ইকবাল ৮৬
সেহ্‌গল, পি. কে., কর্ণেল ১০৭
সেহ্‌না সিং, লেঃ ১০২
সৈয়দ মামুদ ৭৬
সৌকত আলী ৫
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৩
সত্যমূর্তি, এস ২৬
সম্পূর্ণানন্দ ৮
স্বামী, এন, জি ৮৬, ৮৮
স্বামীনাথন, লক্ষ্মী (সেহ্‌গল), লেঃ কর্ণেল ৯৩, ৯৪

হরি সিং ১০১
হাবিব সাহেব ৯৭
হাসান, আবিদ ৮৮
হীরেন মুখার্জী ৫০, ৫১
হ্যালেট, মরিস, স্যর ১৫, ১৬

17-2-04